ধর্মকারী
dhormockery
নিবেদিত

নরসুন্দর মানুষ
নির্মিত

অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রথম নিষিদ্ধ বই

রঙ্গিলা রসুল

পণ্ডিত চমূপতি এম. এ

ভাষান্তর
জুপিটার জয়প্রকাশ

রঙ্গিলা রসুল

(The Playboy Prophet)

পণ্ডিত চমূপতি

ভাষান্তর

জুপিটার জয়প্রকাশ

মূল বইয়ের প্রকাশক

শহীদ-এ আজম মহাশয় রাজপাল,

লাহোর

মূল বইয়ের বিতরক

মহম্মদ রফী

সবজী মন্ডী,

দিল্লী.

একটি ধর্মকারী ইবুক

www.dhormockery.com
www.dhormockery.net
www.kufrikitab.blogspot.com
dhormockery@gmail.com

রঙ্গিলা রসুল

(The Playboy Prophet)

পণ্ডিত চমূপতি

ভাষান্তর: জুপিটার জয়প্রকাশ

ইবুক সংস্করণ: এপ্রিল, ২০১৭

ভাষান্তর স্বত্ব: জুপিটার জয়প্রকাশ

এই বইয়ের আংশিক বা পূর্ণ অংশ লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ড অথবা অন্য কোনো তথ্যসংরক্ষণ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা যাবে না।

ধর্মকারী ইবুক

প্রকাশক

ধর্মকারী

ঢাকা,

বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ: 'শার্লি এবদো'-এর কার্টুন অবলম্বনে

নরসুন্দর মানুষ

ইবুক তৈরি

নরসুন্দর মানুষ

মূল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।

Rongila Rosul, by Pondit Chomupoti

Translate in Bengali by Jupiter JoyProkash

First eBook Edition: April, 2017

Published by: Dhormockery eBook

Dhaka, Bangladesh.

Created by: NoroSundor Manush

উৎসর্গ

সেই মহান যোদ্ধা, সাহসী, বিদ্বানকে এই কীর্তি সমর্পণ করা হইল, যিনি এই সংসারের নিকট 'হজরত মহম্মদ' সাহেব-এর জীবনচরিত্র প্রকাশ করিয়া সঠিক দিগদর্শন করাইয়াছেন এবং তাহার ফলস্বরূপ ছোরার আঘাতে শহীদ হইয়াছেন। এই পুণ্যাত্মার প্রতি আমার অন্তিম প্রণাম।

পণ্ডিত চমূপতি (লেখক)

'রঙ্গিলা রসুল' সমাচার, পাকিস্তান জন্মে এর সম্ভাব্য ভূমিকা এবং পাকিস্তানে ব্লাসফেমি আইন অধ্যায়টি ব্যতিত সকল লেখাই মূল বইয়ের অনুরূপ রাখা হয়েছে, বইটির বেশিরভাগ অংশের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ২০১৩ সালে www.logicalforum.com ওয়েবসাইটে; ইবুকটি আলোর মুখ দেখার পেছনে **দাড়িপাল্লা ধমাধম**-এর অবদান রয়েছে।– **জুপিটার জয়প্রকাশ**

মূল বইয়ের প্রচ্ছদ

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল** **বা** **বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

উৎসর্গ :০৪

মূল বইয়ের প্রচ্ছদ :০৫

'রঙ্গিলা রসুল' সমাচার :০৭

ইতিহাস :২০

প্রস্তাবনা :২১

!!ওম!! :২৩

ঈশ্বরের অন্তিম বার্তাবাহক :২৪

বৃদ্ধাচারী মহম্মদ :২৬

মাতা খাদীজা :২৮

পুত্রী আয়েশা :৩৪

সদা সোহাগিনী :৪১

পুত্রবধু সমাচার :৪৪

হারেমের শোভা :৫০

বিবিওয়ালা হজরত মুহম্মদ :৫৮

মহম্মদের অভিজ্ঞতা :৬২

রামধনু রঙ :৬৭

শেষ পৃষ্ঠা :৭০

‘রঙ্গিলা রসুল’ সমাচার, পাকিস্তান জন্মে এর সম্ভাব্য ভূমিকা এবং পাকিস্তানে ব্লাসফেমি আইন

মুস্তফা ঠাকুর

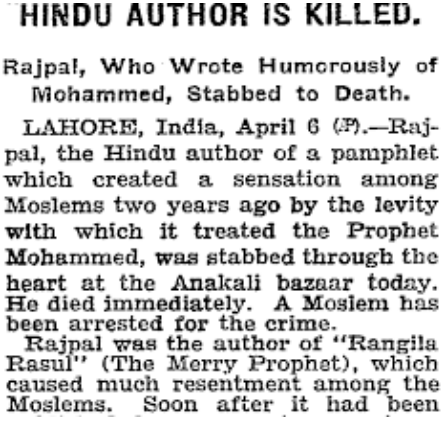

HINDU AUTHOR IS KILLED.

Rajpal, Who Wrote Humorously of Mohammed, Stabbed to Death.

LAHORE, India, April 6 (AP).—Rajpal, the Hindu author of a pamphlet which created a sensation among Moslems two years ago by the levity with which it treated the Prophet Mohammed, was stabbed through the heart at the Anakali bazaar today. He died immediately. A Moslem has been arrested for the crime.

Rajpal was the author of "Rangila Rasul" (The Merry Prophet), which caused much resentment among the Moslems. Soon after it had been

রঙ্গিলা রাসুল এবং এবং একজন জাতীয় বীর ‘ইলমুদ্দিন’

১৯২০-এর দশকে পাঞ্জাবের মুসলিমরা এবং হিন্দু আর্য সমাজ একটি একটি রাজনৈতিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল। মুসলিমরা একটি পুস্তিকা বা প্যামফ্লেট প্রকাশ করে, যেখানে হিন্দুদের দেবী সীতাকে পতিতা হিসেবে দেখানো হয়। বলা হয়, এরই প্রতিশোধ নেবার জন্য আর্য সমাজের স্বামী দয়ান্দের এক অনুসারী কৃষ্ণ প্রসাদ প্রতাব, পণ্ডিত চামুপতি লাল ছদ্মনামে একটি পুস্তিকা লেখেন। এর নাম ছিল “রঙ্গিলা রাসুল”। লাহোরের এক প্রকাশক রাজপাল ১৯২৩ সালে পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় নবী মুহম্মদের সাথে হজরত আয়শার বিবাহকে ফোকাস করা হয় যে, আয়শা ছিল নবী

মুহম্মদের থেকে বয়সে অনেক ছোট। আর সেই সাথে প্রকাশ করা হয় বহুবিবাহের কুপ্রভাবসহ বিভিন্ন বয়সী নারীকে বিবাহের সমস্যাবলি। এই পুস্তিকাতে বেশ কিছু নির্দিষ্ট হাদিসেরও উল্লেখ ছিল।

মুসলিমরা এই পুস্তিকার বিষয়াবলির ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে এই ব্যাপারটিকে আদালতে নিয়ে যায়। আদালত রাজপালকে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করে। পরবর্তীতে আপিল করা হলে কোর্ট এই বিচারকে সমর্থন করে। যাইহোক, রাজপাল এরপর হাইকোর্টে যায়। হাইকোর্ট তাকে নির্দোষ প্রমাণ করে, কারণ তিনি যা করেছেন, তা ইন্ডিয়ান পেনাল কোড-এর ১৫৩ ধারা অনুযায়ী কোনো অপরাধের মধ্যে পড়ে না। হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত মুসলিমদেরকে গভীরভাবে ক্ষুব্ধ করে।

ইলমুদ্দিন নামে ১৯ বছর বয়সী এক কাঠমিস্ত্রীর ছেলে তার বন্ধুদের সাথে লাহোরের মসজিদ ওয়াজির খান এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা তখন মসজিদের মোল্লার জ্বালাময়ী ভাষণ শোনে, যেখানে ইসলামের নবীকে অমর্যাদাকারী ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য লোকজনকে একত্রিত করা হচ্ছিল। বলা হয়, এই ভাষণদাতা ছিলেন সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বুখারি, আর ভাষণটি দেয়া হয়েছিল ১৯২৯ সালের ৬ এপ্রিলে। ভাষণ শুনে ইলমুদ্দিন এক রুপি দিয়ে একটি ছুরি কেনে। এরপর সে লাহোরের উর্দু বাজারে রাজপালের দোকানে যায় এবং রাজপালকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। সে পালিয়ে যাবার কোনো চেষ্টা করেনি। এতে তাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করা হয় এবং মিয়ানওয়ালি কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ইলমুদ্দিন এমন একজনকে হত্যা করে, যিনি সেই লেখাটার লেখক ছিলেন না। হয়তো ইলমুদ্দিন এবং রাজপালের কেউই সেই পুস্তিকাটি পড়েনি। কিন্তু সেই মোল্লার তীব্র ভাষণ এই ১৯ বছরের কিশোরকে সেদিন জঘন্যতম অপরাধটি করতে প্রভাবিত করেছিল, তাও এমন একজনকে, যাকে সে কোনোদিন চোখেও দেখেনি।

বিচারে ইলমুদ্দিনের পক্ষের আইনজীবী ফারুক হুসাইন দাবি করেন, ইলমুদ্দিন দোষী নয়, তাকে প্রভাবিত করা হয়েছিল। কিন্তু আদালত ইলমুদ্দিনের বিরুদ্ধে রায় দেয় এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। এরপর লাহোর হাইকোর্টে একটি আপিল করা হয়, যেই আপিলের আইনজীবী ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। কিন্তু যাই হোক, মামলাটিতে তার পরাজয় হয়। পরবর্তীতে ইলমুদ্দিন রাজা পঞ্চম জর্জের প্রতি একটি মার্সি পিটিশন বা ক্ষমা চেয়ে দরখাস্ত করে, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

১৯২৯ সালের ৩১ শে অক্টোবর ইলমুদ্দিনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। মিয়ানওয়ালিতে ইলমুদ্দিনকে কবর দেয়া হয় যেখানে মুসলিমরা তার লাশকে লাহোরে দাফন করতে চেয়েছিল। ব্রিটিশরা ভয় পেয়েছিল যে, এটা এক ধরনের উত্তেজনা তৈরি করবে, যা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা তৈরি করতে পারে। কেবল আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল এবং মিয়া আবদুল আজিজ এর নিশ্চিন্তকরণের পরই তার দেহ কবর থেকে ১৫ দিন পর তুলে আনা হয় এবং লাহোরে আবার কবর দেয়া হয়।

ইলমুদ্দিনের লাশ ১৯২৯ সালের ১৪ই নভেম্বরে পুনরায় কবর থেকে তোলা হয়। দুই দিন পর লাশ লাহোরে পৌঁছে। সমস্ত শহর এবং আশেপাশের অনেক অঞ্চল থেকে মুসলিমরা তার জানাজায় আসে। ডঃ আল্লামা ইকবালকে ইলমুদ্দিনের বাবা জানাজার নামাজের ইমাম হতে বলেন। কিন্তু ইকবাল সাহেব সেটা করতে চাননি। তিনি বলেন, "আমি একজন পাপী ব্যক্তি, ইসলামের এই বীরের জানাজার নামাজের ইমাম হবার যোগ্যতা আমার নেই।" দুই লক্ষ মুসলিম এই জানাজায় অংশগ্রহণ করেছিল, যা মসজিদ ওয়াজির খান-এর ইয়াম ইমাম মুহম্মদ শামসুদ্দীন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কবি এবং সাংবাদিক মওলানা জাফর আলী সেখানে বলেন, "হায়! যদি আমি এরকম এক আশীর্বাদপুষ্ট সম্মান অর্জন করতে পারতাম!" আল্লামা ইকবাল এই লাশ বহন করে নিয়ে যান। যখন ইকবাল সাহেব এই লাশটিকে তার কবরে রাখতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বলেন, "এই অশিক্ষিত তরুণটি আমাদের মত শিক্ষিতদেরকে ছাড়িয়ে গেছে।"

সেদিন মুসলিম নেতাদের আচরণ আশানুযায়ী ছিল না। স্যার মুহমদ ইকবাল, যিনি পরবর্তীতে পাকিস্তানের জাতীয় কবি হন, এবং মওলানা জাফর আলী খান কেবল তার প্রশংসাই করেননি, তাকে বীরের মর্যাদা দেন।

এবারে জিন্নাহর কথায় আসি। সেই সময় জিন্নাহ বোম্বেতে (বর্তমান ভারতের মুম্বাই) আইন প্র্যাকটিস করতেন। প্রশ্ন হল, তিনি বোম্বেতে প্র্যাকটিস করলেও লাহোরের একটি মামলায় নিজেকে সে সময় জড়িয়েছিলেন কেন? যাই হোক, তার আগে বলে নিই, সেই সময় জিন্নাহ কেবলমাত্র একজন আইনজীবী ছিলেন না, তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং একজন জনপ্রতিনিধিও ছিলেন। জিন্নাহ সেই সময় কংগ্রেসের সাথে সমস্ত সম্পর্ক শুধু ছিন্নই করেননি, একই সাথে তিনি ১৯২৯ সালের ২৮ মার্চে তার "১৪ দফা" নিয়ে আসেন। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, ধর্মীয় আবেগের সাথে সম্পর্কের কারণেই মামলাটির প্রতি তিনি এত আগ্রহী ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটাই ইলমুদ্দিনের খ্যাতিকে ব্যবহার করে ভারতের সকল মুসলিমের মধ্যে একটি রাজনৈতিক চেতনা ও ধর্মীয়বোধ তৈরি করার একটি সুবর্ণ সুযোগ। আর তাই তিনি তার মামলাটি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

কিন্তু আপিল বিভাগের ক্ষেত্রে হলেও জিন্নাহ কি এই মামলাটি গ্রহণ করে উচিত কাজ করেছিলেন? একজন রাজনৈতিক নেতার আচরণ তার অঞ্চলের সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে। তার মতামত একটি ন্যাশনাল সাইকি বা জাতীয় মনোভাবে পরিণত হয়ে যায়। জিন্নাহ কেসটি হাতে নিয়ে ও ইলমুদ্দিনকে সমর্থন করে সকলকে এই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, কেউ যদি ধর্ম অবমাননাকারীকে হত্যা করে, তাহলে সে একজন খুনের আসামী হলেও তাকে সমর্থন করা উচিত। ধর্মাবমাননাকারীকে যে হত্যা করেছে, তার সাত খুন মাফ। তার মতো একজন রাজনৈতিক নেতার পক্ষে এমন কাজ করাটা ছিল ন্যাক্কারজনক। জিন্নাহ অবশ্যই জানতেন যে, ইলমুদ্দিনকে এভাবে সমর্থন করাটা তার অনুসারীদের কাছে ইলমুদ্দিনকে একজন জাতীয় বীর বানিয়ে দেবে, সকল মুসলিম

তাকে সমর্থন দেয়া শুরু করবে, মুসলিমদের মাঝে পরধর্মবিদ্বেষ বাড়াবে ও হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাকে আরও উসকে দেবে।

পরে হয়েছিলও তাই। জিন্নাহর অংশগ্রহণ ইলমদ্দিনকে জাতীয় বীরে পরিণত হবার কাজে আরও বেশি সাহায্য করে। লাহোরে মোল্লারা মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে অনেক মিছিল বের করেছিল। পাঞ্জাবের মুসলিমদের মধ্যে এর মধ্য দিয়ে একটি রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ঘটে। যার ফলে দেখা যায় ইলমুদ্দিনের জানাজায় দুই লক্ষ মুসলিমের অংশগ্রহণ। সাধারণ মুসলিমদের মনে ইলমুদ্দিনের ফাঁসি যে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল তারই বহিঃপ্রকাশ হয়তো আমরা লাহোর সহও ভারতের অন্যান্য স্থানে ৪৭-এর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাগুলোতে দেখেছিলাম। যাই হোক, পাকিস্তান জন্মের পরে এই ইলমুদ্দিনের নামে বহু রাস্তা, পার্ক ও হাসপাতাল তৈরি হয়েছে।

তো জিন্নাহর সেই আচরণটি পরবর্তীতে পাকিস্তানে কী প্রভাব ফেলেছে তা একটু পরে দেখবেন। এমনও হতে পারে, ইলমুদ্দিনের পক্ষে কাজ করার জন্যই জিন্নাহ পরবর্তীতে ভারতের সমস্ত মুসলিমের অবিসংবাদী নেতায় পরিণত হন। এ রকম বলার কারণও একটু পরে বলছি।

আল্লামা ইকবাল ও পাকিস্তানের স্বাধীনতায় "রঙ্গিলা রাসুল" এর সম্ভাব্য ভূমিকা

কাকতালীয় বা কোইনসিডেন্স কি না, জানি না, ইলমুদ্দিনের ফাঁসির কয়েকমাস পরেই আমরা আল্লামা ইকবালের পাকিস্তান সৃষ্টির যুগান্তকারী ধারণাগুলোর অভ্যুত্থান দেখতে পাই, আর সেই সাথে দেখতে পাই তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতাদের প্রতি তাঁর ক্ষোভ। একই সাথে দেখা যায় সেক্যুলারিজম ও জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ।

ইকবাল ১৯৩০ সালে লাহোরে ছয়টি ইংরেজি লেকচার প্রদান করেছিলেন। আর এরপর ১৯৩৪ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসে এই লেকচারগুলো নিয়ে "The Reconstruction of Religious Thought in Islam" বা "ইসলামের ধর্মচিন্তার

পুনঃপ্রতিষ্ঠান” নামক বইটি প্রকাশ করেন। এই বইগুলো মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও আলিগড়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই লেকচারগুলোতে বর্তমান যুগে ইসলামের ধর্ম ও রাষ্ট্রদর্শন-আইনদর্শন (পলিটিকাল এন্ড লিগাল ফিলোসফি) হিসেবে দ্বৈত ভূমিকার কথা বলা হয়। অর্থাৎ তাঁর সেই লেকচারগুলো অনুসারে, ইসলাম শুধুমাত্র একটি নিছক ধর্ম নয়, এটা একটি রাজনৈতিক ও আইনগত নির্দেশনা। কাউকে ইসলাম পালন করতে হলে তাকে ইসলামের এই রাজনৈতিক ও আইনগত দর্শনকে অন্তর থেকে মেনে চলতে হবে। এই লেকচারগুলোতে ইকবাল সেসময়ের মুসলিম রাজনীতিবিদদের আচরণ ও প্রবণতার তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, সকল মুসলিম রাজনীতিবিদ নীতিহীন ও বিপথগামী হয়ে পড়েছে। তারা কেবল ক্ষমতা নিয়েই সুখে থাকতে চায়, আম মুসলিম জনতার পাশে তারা একেবারেই দাঁড়াতে চায় না।

ইকবাল তাঁর ভীতি সম্পর্কে বলেন, সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলাম ও মুসলিম সমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে কেবলমাত্র ধ্বংসই করে দেবে না, বরং ভারতের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যাও মুসলিমদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক অবস্থানকে প্রভাবিত করবে। তিনি তাঁর মিশর, আফগানিস্তান, ইরান ও তুরস্ক ভ্রমণেও বৃহৎ ইসলামিক রাজনৈতিক সহযোগিতা ও একতাকে প্রমোট করেছিলেন। তিনি এই সকল মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যকার জাতীয়তার পার্থক্যকে ঘুচিয়ে দেবার দাবি তুলেছিলেন। বিভিন্ন আয়োজনে তিনি মুসলিম রাজনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিত করার কথা বলেছিলেন। ডঃ বি আর আম্বেদকারের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তিনি ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলোকে সরাসরি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে স্বয়ংসম্পূর্ণ একক হিসেবে দেখতে চান, কিন্তু কোনো কেন্দ্রীয় ভারতীয় সরকার তিনি চান না। তিনি ভারতে একটি স্বায়ত্বশাসিত মুসলিম অঙ্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখেন। তিনি ভয় পেতেন যে, একটি একক ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে মুসলিমরা থাকলে তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে বৈষম্যের শিকার হতে হবে। ১৯৩০ সালে এলাহাবাদ অধিবেশনে আল্লামা ইকবাল মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত

হন এবং তিনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের অধিনে একটি স্বাধীন অঙ্গরাজ্য গঠনের লক্ষ্য স্থির করেন। তিনি বলেন,

"আমি পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে একটি একক রাজ্য দেখতে চাই, যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ছাড়াই একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকার গঠন করবে। একটি একক উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলিম রাজ্যই আমার চোখে ভারতের মুসলিমদের অন্তিম ভাগ্য, অন্তত উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিমদের জন্য তো বটেই।"

তাঁর এই বক্তৃতায়, ইকবাল জোর দিয়ে বলেন, ইসলাম ধর্ম খ্রিষ্টধর্মের মত নয়। ইসলাম তার আইনী ধারণা, রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং তার ধর্মীয় আদর্শকে সাথে নিয়ে এসেছে, যাকে একটি অলঙ্ঘনীয় সামাজিক নীতি বলেই বিবেচনা করতে হবে। তাই,

"জাতীয়তার ভিত্তিতে কোনো নীতি প্রস্তুত করার অর্থ হল - ইসলামী সার্বভৌমত্বের নীতি থেকে দূরে সরে আসা। মুসলিমদের ক্ষেত্রে এটা চিন্তা করা যায় না।"

এভাবে ইকবাল মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি রাজনৈতিক একতাই শুধু চাননি, তিনি ইসলামী নীতি ভিন্ন অন্য কোনো নীতির অধীনে কোনো বিস্তৃত সম্প্রদায়ের মাঝে মুসলিমদের অস্তিত্বকেও মেনে নিতে পারেননি। একইভাবে তিনি কোনো জাতিসত্তার ভিত্তিতে আলাদা আলাদা রাজ্য বা রাষ্ট্র গড়ে উঠুক তাও কখনও চাননি। তাঁর কাছে ধর্মই রাষ্ট্র বা রাজ্য তৈরির মূল ভিত্তি ছিল। যাই হোক, এভাবেই আল্লামা ইকবাল সাহেব প্রথম একটি তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন, পরবর্তীকালে যা "দ্বিজাতিতত্ত্ব" নামে পরিচিতি পায়। এই নীতি অনুসারে, মুসলিমরা একটি আলাদা জাতি এবং তাই তারা সবসময় ভারতের অন্যান্য অঞ্চল ও অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আশা করে। তিনি পরিষ্কারভাবে তাঁর স্বপ্নের রাষ্ট্রে বা রাজ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন।

তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, আল্লামা ইকবালের রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শগুলোর সব ক'টির জন্মই হয় ১৯৩০ সালে ইলমুদ্দিনের মৃত্যুর কয়েক মাস পর। আমি এটা বলছি না যে, রঙ্গিলা রাসুলের প্রকাশে ক্ষুব্ধ হওয়া কিংবা ইলমুদ্দিনের মৃত্যুর কারণে শোকাগ্রস্ত হয়ে তিনি এরকম একটার পর একটা তত্ত্বের জন্ম দিতে থাকেন। আমি এটাই বলতে চেয়েছি শুধু, ইলমুদ্দিন তৎকালীন ভারতীয় পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিমদের একটি বড় অংশের মানুষের মধ্যে যে একটি ক্ষোভ ও ধর্মীয় চেতনার সৃষ্টি করেছিল, তা হয়তো আল্লামা ইকবালকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করেছিল। এখান থেকে আমরা আরেকটি বিষয় যেটা লক্ষ্য করছি, তা হল - অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতার প্রতি আল্লামা ইকবালের প্রচণ্ড ক্ষোভ। ইকবাল বারবার বলছিলেন যে, নেতারা ইসলাম ও সাধারণ মুসলিমদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তারা সঠিক ইসলাম মেনে চলছে না। জিন্নাহ থেকে শুরু করে সকল মুসলিম লীগ নেতার ওপরেই তাঁর এই রাগ ছিল। কিন্তু এই রাগ মুসলিম লীগ নেতাদের ইলমুদ্দীনের পাশে তেমনভাবে না দাঁড়ানোর কারণেও কিছুটা হতে পারে। সাধারণ মুসলিমের পাশে দাঁড়ানো বলতে তিনি ইলমুদ্দিনকে সমর্থন করা হাজার মানুষের পাশে দাঁড়ানোকেও বোঝাতে পারেন। যাই হোক, সকল মুসলিম লীগ নেতার প্রতি ক্ষোভ থাকলেও পরবর্তীতে আমরা জিন্নাহর প্রতি ইকবালের আস্থা ও সমর্থনকে দেখতে পাই।

ইকবাল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, জিন্নাহই একমাত্র নেতা, যিনি ভারতের মুসলিমদের একত্রিত করতে পারেন এবং ব্রিটিশদের ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। তিনি জিন্নাহকে চিঠি লেখেন, "আমি জানি, আপনি খুব ব্যস্ত। কিন্তু আমি আশা করি, আমি যদি মাঝেমাঝে আপনাকে চিঠি লিখি, আপনি কিছু মনে করবেন না, কারণ আপনিই এখন ভারতের একমাত্র মুসলিম, যাকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় এবং, সম্ভবত, সমগ্র ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় তাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে আস্থা রাখতে পারে।"

ঐতিহাসিকগণ বলেন, জিন্নাহ কংগ্রেসের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করলেও কংগ্রেসের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং ভারত বিভাগ তিনি চাননি। কিন্তু ১৯৩০ সালে একটি আলাদা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যের ধারণা তৈরির পর থেকেই ইকবাল বারবার জিন্নাহকে পাকিস্তান নামে একটি আলাদা রাষ্ট্র তৈরির কথা বলতে থাকেন।

শেষ পর্যন্ত জিন্নাহ ১৯৪০ সালে অফিশিয়ালি ঘোষণা দেন যে, পাকিস্তান সৃষ্টিই তাঁর লক্ষ্য। ইকবাল জিন্নাহকে সবসময়ই একটি আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের গঠনের জন্য কথা বলে আসছিলেন। ১৯৩৭ সালের ২১ শে জুন জিন্নাহকে লেখা ইকবালের একটি চিঠি দেখুন:

একটি আলাদা মুসলিম অঙ্গরাজ্যই কেবল ভারতকে শান্তিপূর্ণ রাখতে পারে এবং মুসলিমদেরকে অমুসলিমদের কর্তৃত্ব থেকে রক্ষা করতে পারে। কেন উত্তর পশ্চিম ভারত এবং বাংলার মুসলিমদেরকে একটি জাতি হিসেবে বিবেচনা করা হবে না, যে জাতি নিজের সিদ্ধান্তেই চলতে পারে, যেমনটা ভারতের মধ্যকার জাতিগুলো এবং বাইরের জাতিগুলো চলছে?

পাঞ্জাব মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে ইকবাল জিন্নাহর রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও পাঞ্জাবী নেতা স্যার সিকান্দার হায়াত খানের রাজনৈতিক চুক্তির সমালোচনা করেন, যাদেরকে ইকবাল সামন্তপ্রভু শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে দেখতেন এবং যারা ইসলাম ও তার মূল রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন না। যাই হোক, ইকবাল প্রতিনিয়তই মুসলিম নেতাদের ও জনগণকে জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগকে সমর্থন করতে উৎসাহিত করেছেন। ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলার সময় তিনি বলেন:

কেবল একটাই রাস্তা খোলা আছে। মুসলিমদেরকে জিন্নাহ্‌র হাত শক্ত করতে হবে। তাদের সবাইকে মুসলিম লীগে অংশগ্রহণ করা উচিত। আমরা সকলে একত্রে মিলিত

হলেই কেবল হিন্দু ও ব্রিটিশ উভয়ের বিরুদ্ধেই ভারতের প্রশ্নে লড়াই করতে পারব। এটা ছাড়া আমাদের দাবি কখনই বাস্তবায়িত হবে না। সবাই বলবে, আমাদের দাবি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াবে। কিন্তু সেটা তাদের আমাদের উদ্দেশ্যকে বানচাল করার কৌশল ছাড়া আর কিছুই না। এই দাবি আমাদের জাতীয় অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য... মুসলিম লীগের নেতৃত্বে এই যুক্তফ্রন্ট গঠিত হতে পারে। আর কেবল জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বেই মুসলিম লীগ বিজয়ী হতে পারে। এখন জিন্নাহ ছাড়া আর কেউই মুসলিমদের নেতৃত্বদানের ক্ষমতা রাখে না।

প্রশ্ন হচ্ছে: যেখানে ১৯৩০ সালের দিকে আল্লামা ইকবাল সমস্ত মুসলিম লীগ নেতার ওপরেই ক্ষুব্ধ ছিলেন, তিনি হঠাৎ করে জিন্নাহর ওপরে এত দরদ দেখানো শুরু করলেন কেন? এর কারণ এটা নয় তো যে, জিন্নাহ ইলমুদ্দিনের কেসে বোম্বে থেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন? আর এ কারণে অন্যান্য যে কোনো নেতার চাইতে জিন্নাহই ইকবালের কাছে এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন আর জিন্নাহর চোখ দিয়েই ইকবাল সাহেব পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখতে থাকেন?

হতে পারে। কিন্তু এতে জিন্নাহর নিজের উপকার হয়নি কি? আল্লামা ইকবাল যখন সকলকে কেবল জিন্নাহকেই মুসলিমদের স্বাধীনতা এনে দিতে একমাত্র সক্ষম নেতা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন, তখন ভারতের সকল মুসলিমের কাছে জিন্নাহ এক অবিসংবাদী নেতায় পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন।

পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা, ব্লাসফেমি আইন এবং ইলমুদ্দিন ইস্যু

এতক্ষণ যা বলেছি, তার সবই থিওরি মাত্র। এর কোনো নিশ্চিত সত্যতা নেই। কিন্তু এখন যা বলব, সেগুলো ফ্যাক্ট। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। একশো বছর আগে লাহোরে ধর্মানুভূতিতে আঘাত নিয়ে যে-সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তা আজ পাকিস্তানের

লাহোরসহ অন্যান্য অঞ্চলে এখনও হয়ে চলেছে। এর আগে, চলুন, কিছু জিনিস জেনে নেয়া যাক।

ইলাম দিনের হত্যার অনেক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল। এর ফলে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে একটি নতুন অধ্যাদেশ যুক্ত হয়, যেখানে কারও ধর্মানুভূতিতে আঘাত করলে তা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। পরবর্তীতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবার পর পাকিস্তান পেনাল কোড অনুসারে "কথায়, দৃশ্যতভাবে, অভিযোগের মাধ্যমে বা ব্যঙ্গ করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে নবী মুহম্মদকে অপমান করা" -কে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। এরপর প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সময়ে ১৯৮২ সালে ২৯৫বি সেকশনে কোরান অবমাননার শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১৯৮৬ সালে ২৯৫সি সেকশন অনুযায়ী নবী মুহম্মদ সম্পর্কে কটুক্তি করলে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেয়া হয়।

এখন আসি পাকিস্তানের অবস্থা ও এই ব্লাসফেমি আইনের অপব্যবহার প্রসঙ্গে। পাকিস্তানের কারাগারগুলোতে দেখা যায়, সেখানকার কয়েদিদের একটি বড় অংশ ব্ল্যাসফেমি আইনের দায়ে দণ্ডিত। এর মধ্যে বেশিরভাগই যে খ্রিষ্টান, হিন্দু ও আহমদিয়া (এরা রাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত অমুসলিম) হবে, তা তো বোঝাই যায়, কিন্তু এরা ছাড়াও এখানে কিছু মুসলিমও আছে। জানা যায়, তাদেরকে ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে ব্ল্যাসফেমি আইনে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। কখনও সম্পত্তি নিয়ে কলহের কারণে, কখনও জমিজমা নিয়ে ঝামেলার কারণে বা কখনও ব্যক্তিগত বিরোধের সূত্রে তাদের ওপরে ব্লাসফেমি আইন এক ধরনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এ তো গেল আইনিভাবে ভুক্তভোগীদের কথা। আবার জিন্নাহর কথায় ফিরে আসি। ইলমুদ্দিনকে সমর্থন করে জিন্নাহ তাঁর জাতির পুত্রদেরকে একটা জিনিস খুব ভালভাবেই শিখিয়ে গেছেন, সেটা হল - ধর্মরক্ষায় আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া হয়েছে এই অজুহাতে দোষীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। জিন্নাহ এই কাজটি করে

ইলমুদ্দিনকে তো বীরের আসনে বসিয়েছেনই, সেই সাথে এরকম আরও যে করবে, তারাও পাকিস্তানে বীর বলে বিবেচিত হবে, সেই ইঙ্গিতও তিনি এরই মাধ্যমে দিয়ে গেছেন। অনেক জায়গায় ধর্ম অবমাননার কারণে বিচার বহির্ভূতভাবে মানুষকে হত্যা করা হয়। হত্যাকারীরা মনে করে, ধর্ম অবমাননাকারী কাউকে যদি হত্যা করা হয়, তাহলে সেটা বৈধ বলে বিবেচিত হবে এবং সেটাকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। আবার এরকমও তারা মনে করে যে, কাউকে হত্যা করে তার নামে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ চাপিয়ে দিলে শাস্তির আর কোনো ভয় থাকবে না। মজার ব্যাপার হল, তাদের এই চিন্তাটি খুব একটা অবাস্তব নয়। সত্যি সত্যি এদেরকে রক্ষা করতে আইনজীবী, মোল্লারা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতারা পর্যন্ত সবাই এগিয়ে আসে। বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে একটা উদাহরণ দিই।

এটা একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। মুহম্মদ কাদরি ছিল পাকিস্তানের একজন পুলিশ এবং ইসলামিক মৌলবাদী। সে এলিট ফোর্সের কমান্ডো হিসেবে প্রমোটেড হয় এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের গভর্নর সালমান তাসীরের বডিগার্ড হয়। সে ২০১১ সালের ৪ জানুয়ারিতে সালমান তাসীরকে গুপ্তহত্যা করে। তার ভাষ্যমতে, সালমান তাসীর বিবি আয়শাকে দোষারোপ করেছিল বলে ধর্ম অবমাননার কারণে সে তাকে হত্যা করেছে।

এরপরেই খেলা শুরু। জিন্নাহর উদাহরণ ধরে পাকিস্তানের শিক্ষিত আইনজীবীদের মঞ্চে প্রবেশ। সেদিনকার জিন্নাহর মতই মুহম্মদ কাদরীর কেসকে ডিফেন্স করেছেন লাহোর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত চিফ জাস্টিস খাজা মোহাম্মদ শরিফ এবং অবসরপ্রাপ্ত জাস্টিস মিয়া নাজির আক্তার, যারা মুমতাজ কাদরি কেসের আপিলেট ডিফেন্স লইয়ার ছিলেন। সস্তা খ্যাতি পাওয়ার জন্য তারা ইলমুদ্দিনের উদাহরণ ব্যবহার করে জিন্নাহরই মত খুনিকে সমর্থন করছেন। কিন্তু এটা ভুলে গেছেন যে, ধর্ম অবমাননার কারণে কাউকে খুন করলেও খুন খুনই হয়। শুধু তাই নয়, তাঁরা এটাও চিন্তা করছেন না যে, তাদের

মুমতাজ কাদরিকে সমর্থন দেবার ফলে কাদরি সকলের কাছে জাতীয় বীরে পরিণত হবেন এবং সালমান তাসীরকে হত্যা করা সকলের চোখে বৈধ হয়ে যাবে, আর এই উদাহরণটি পরবর্তীতে আরও বেশি অমুসলিম ও একইসাথে মুসলিম নিরপরাধী ব্যক্তিকেও ভোগাবে। আর এটাও তো প্রমাণ করার কোনো পথ নেই যে, সালমান তাসীর আসলেই ধর্ম অবমাননা করেছিল কি না।

১৯২৯ সালের অক্টোবরে ইলমুদ্দিনের ফাঁসি ঠেকাতে মোল্লারা অনেক প্রতিবাদ মিছিল বের করে। একইভাবে দেখা গেছে, মুমতাজ কাদরির মুক্তির জন্যও মোল্লারা অনেক প্রতিবাদী মিছিল বের করেছে, রাইট উইং কলামিস্টরা তাকে নিয়ে বিস্তর লেখালেখি করেছে, তার সপক্ষের শিক্ষিত আইনজীবীরা যে-বিচারক কাদরির মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, তার অফিস ভাংচুর করেছে। যাই হোক, ৬ অক্টোবর ২০১১ সালে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আর দীর্ঘ ৫ বছর পর ২০১৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারিতে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

ব্ল্যাসফেমি আইনের কুপ্রভাব পাকিস্তানে এখন খুব ভালভাবেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পাকিস্তানের এই বর্তমান চিত্রটি দেখলে আমাদের চোখের সামনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ চিত্রটাই ভেসে ওঠে। এরকম দিন এই বাংলাতেও আসবে কি না, এটা ভেবে ভয় হয়।

তথ্যসূত্র:

1. http://www.rationalistpakistan.com/from-ghazi-to-qadri/
2. http://www.siasat.pk/forum/showthread.php?53028-The-Story-of-Ghazi-Ilm-Din-Shaheed
3. http://www.allamaiqbal.com/person/biography/biotxtread.html
4. http://www.allamaiqbal.com/person/movement/move_main.htm
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Mumtaz_Qadri

ইতিহাস

পণ্ডিত চমূপতি ছদ্মনামে এক আর্যসমাজী এই **'রঙ্গীলা রসুল'** গ্রন্থটি রচণা করেন। লাহোরের রাজপাল প্রকাশনী হইতে এটি প্রকাশিত হয়। এজন্য মুসলিম সমাজের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রকাশক শহীদ আজম রাজপালকে আদালতে উঠানো হইয়াছিল, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তিনি এই গ্রন্থের রচয়িতার পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। পাঁচ বৎসর মামলা চলিবার পর প্রকাশক আজম সাহেব এই মামলা হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার উপর বহুবার প্রাণঘাতী আক্রমণ ঘটিয়াছিল। অবশেষে ১৯২৯ সালের ৬ এপ্রিল ইলম-উদ-দীন নামক এক জিহাদী তরুণ আজম সাহেবকে ছোরার আঘাতে হত্যা করিতে সক্ষম হয়। এই মহান কীর্তি সম্পাদন করার ফলে ইলম-উদ-দীন এর ফাঁসি হইয়াছিল।

নিজের জীবন বার বার বিপন্ন করিয়াও প্রকাশক আজম সাহেব যেভাবে গ্রন্থকারকে রক্ষা করিয়াছিলেন সেজন্য লেখক **'পণ্ডিত চমূপতি'** আজম সাহেবের প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

প্রস্তাবনা

হজরত মহম্মদ সাহেব এর পঁচিশ বৎসর বয়সকাল হইতে লেখক এই পুস্তকের সূচনা করিয়াছেন। ইহার পূর্বকালের কোনো তথ্য এই পুস্তকে নাই। এজন্য পাঠকের জ্ঞাতার্থে সংক্ষেপে তাঁহার জন্ম হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কাহিনী পাঠকের নিকট জানাইয়া আমার পবিত্র কর্তব্য পালন করিতেছি।

হজরত মহম্মদ এর পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। তিনি আব্দুল মুত্তালিব এর পুত্র ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন কুরাইশ বংশের সন্তান। এই বংশ আরবের অন্যতম প্রধান গোত্র ছিল এবং তৎকালীন বেদুইনদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ছিল।

মহম্মদ এর জন্ম মক্কায় হইয়াছিল। জন্মের পূর্বেই তাঁহার পিতা আব্দুল্লাহ পরলোকে প্রস্থান করেন। তাই জন্মের পর তাঁহার পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের নিকট তিনি পালিত হইতেছিলেন। মহম্মদের যখন আট বৎসর বয়স তখন আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যু হইল, অতঃপর বালক মহম্মদের দায়িত্ব লইলেন চাচা হজরত আবু তালিব।

মহম্মদের মাতার নাম ছিল আমীনা। কিন্তু সে সময়ের প্রথা অনুসারে শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য তাঁহাকে নিকটের এক গ্রামে হালিমা সাদীয়া নামক এক মহিলার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখান হইতে মাতার নিকট ফিরিয়া আসার অল্পদিন পরেই মাতা আমীনাও দেহরক্ষা করিলেন। ফলে বালক মহম্মদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়িল চাচা আবু তালিব এর উপর। চাচা ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি মহম্মদকে ব্যবসায়ে লাগাইয়া দিলেন এবং ছাগল চরানোর দায়িত্বে নিযুক্ত করিলেন। এই ছাগল চরানোতেই মহম্মদের বাল্যকাল কাটিয়া গেল। প্রভূর কৃপায় অলৌকিক সৌন্দর্য্য, অসাধারণ স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ হৃদয় ও গভীর ভক্তি থাকার পরেও তাঁহাকে দারিদ্র ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়া চলিতে

হইয়াছিল। পিতাকে কখনো দেখেন নাই, মাতাকে অতি বাল্যকালেই হারাইয়াছিলেন। পঁচিশ তম বর্ষে তাঁহার প্রতি খাদিজা নামক এক ধনী বিধবা মহিলার দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার বয়স সেই সময় চল্লিশ বৎসর ছিল। মহম্মদও ইহাতে হৃদয় হারাইয়া ফেলিলেন। ২৫ বৎসরের কষ্টের পর সহসা তাঁহার যেন লটারী লাগিয়া গিয়াছিল। যে ভালবাসা হইতে তিনি আজন্ম বঞ্চিত ছিলেন সেই ভালবাসা একই সঙ্গে পত্নী ও মাতার রূপে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইবার মত সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে! খাদীজার বয়স যদি চল্লিশ না হইয়া ষাট হইত তাহাতেও হজরত এই বিবাহ প্রস্তাবে আপত্তি করিতেন না।

এইবার আপনারা হজরত মহম্মদ সাহেব এর পবিত্র? জীবন চরিত মনযোগ সহকারে পাঠ করিয়া লাভবান হোন। অন্য কোনো পয়গম্বরের এমন শিক্ষাপ্রদ জীবন বৃত্তান্ত পাওয়া কঠিন, যাহা অনুসরণকারীর জন্য স্বর্গ নিশ্চিত। যাহাতে প্রত্যেক বাক্যের সহিত প্রমাণ নিহিত আছে যেগুলিকে সুন্নী মুসলমান ভাইয়েরা প্রামাণ্য হিসাবে মান্য করেন। যদি আপনি ইহাকে নরকের পথ বলিয়া মনে করেন তবে আজই পরিত্যক্ত ঈমান ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন। কারণ কিছু না জানিয়া কাহারো অনুসরণ করা অস্বাভাবিক।

এই জীবন চরিতটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা সহকারে প্রমাণ সহ লিখিত হইয়াছে। ইহাতে পরিষ্কার জানা যায় যে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নিজেই এত পবিত্র যে তাঁহার তুলনা ইতিহাসে আর দ্বিতীয় পাওয়া যায় না! তবে তাঁহার উপদেশ ও সিদ্ধান্ত কতই না শিক্ষাপ্রদ হইবেক। পাঠক স্বয়ং তাহা বিচার করিবেন।

বিতরক

মহম্মদ রফী

!!ওম!!

পয়গম্বরের প্রশংসা

বাগিচায় বুলবুলি যায় যেমন করে ফুলের টানে।
আমি যাই তেমন আমার রঙ্গিলা রসুলের পানে।।

চির বসন্তের রঙ্গিলা রসুল আমার!
লক্ষ পীরের রঙ্গিলা রসুল আমার!!
জগতের সেরা রঙ্গিলা রসুল আমার!
দেবতার প্রিয় রঙ্গিলা রসুল আমার!!

বাগিচায় বুলবুলি যায় যেমন করে ফুলের টানে।
আমি যাই তেমন আমার রঙ্গিলা রসুলের পানে।।

মন্দকে চাও করতে ভালো? বিয়ে করাই সহজ পথ।
আঁধারে চাও জ্বালতে আলো? বিয়ে করাই সহজ পথ।।
দেখতে পেলে রূপের রাণী? বিয়ে করাই সহজ পথ।
দেখলে কারো টাকার খনি? বিয়ে করাই সহজ পথ।।

বাগিচায় বুলবুলি যায় যেমন করে ফুলের টানে।
আমি যাই তেমন আমার রঙ্গিলা রসুলের পানে।।

চমূপতি (এম এ)

ঈশ্বরের অন্তিম বার্তাবাহক
‘হজরত মহম্মদ সাহেব’-এর জীবন-চরিত্র আরম্ভ

মহম্মদের বিশেষত্ব এই যে তিনি গৃহস্থ পয়গম্বর ছিলেন। মুসলমান ভাইয়েরা তাঁহার এই চরিত্র লইয়া গর্ব করেন, যে দেখ; অন্য পয়গম্বরের মধ্যে যাহা নাই তাহা মহম্মদের মধ্যে আছে। এই জন্যই ত মহম্মদ প্রশংসার যোগ্য। এ কথা আমারও হৃদয় স্পর্শ করে।

- দয়ানন্দ বাল-ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি ছিলেন দেবতা। আমরা সামান্য মনুষ্য, তাঁহার ব্রহ্মচর্যের স্তরে যাওয়া আমাদের সাধ্য কি!

- মহাত্মা বুদ্ধ বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। যৌবনকালে পত্নী ও সন্তানকে একলা পরিত্যাগ করিয়া তিনি সাধু হইয়াছিলেন। এমন সাধুতা লাভ করা আশা বা ক্ষমতা আমাদের নাই।

- যীশু ত সংসারের কাজ কিছুই করেন নাই।

- মহম্মদ বিবাহ করিয়াছেন, না! তিনি অজস্র বিবাহ করিয়াছেন। সকল প্রকার নারীকে বিবাহ করিয়াছেন। বিধবা, কুমারী, বৃদ্ধা, যুবতী, হাঁ, একজন নবযুবতীও ছিলেন। তিনি সমস্ত রকম বিবাহেরই রঙ দেখিয়াছেন, তাহাদের ভালমন্দ কেবল বুঝেনই নাই, তাহা প্রয়োগ করিয়া বাস্তব ফলাফলের নিদর্শনও স্থাপন করিয়াছেন।

- মহম্মদ একজন অভিজ্ঞ পয়গম্বর ছিলেন। অভিজ্ঞতাই তাঁহার জ্ঞানের উৎস ছিল। এমন নিম্বপত্রের ন্যায় তিক্ত অভিজ্ঞতাও মহম্মদ মধুর মত পান করিয়াছেন, কেন?

কেবল সকলের মঙ্গলের জন্য! আমাদের জ্ঞান দান করার জন্যই। মহম্মদের জীবন শিক্ষাপ্রদ উপদেশে ও উপাসনায় পরিপূর্ণ। সত্যই তিনি পথ-প্রর্দশক।

- আমি গৃহস্থ, আমার পয়গম্বর গৃহস্থ। তিনি আমার গুরু, আমি তাঁহার শিষ্য। উপনিষদে লিখিত আছে যে গুরুর সদগুণ গ্রহণ করিবে ও অসদ গুণ বর্জন করিবে।

- এই দৃষ্টিকোণ হইতেই আজ আমরা ঘরবাড়ীওয়ালা, রঙ্গিলা, রসিক নাগর রসুলের জীবনের গৃহস্থাশ্রমের উপর এক সরস দৃষ্টিপাত করিতে চাই। মহম্মদী তথা অ-মহম্মদী সকলেই ইহা পাঠ করিতে পারেন, কারণ মহম্মদ ত সকলেরই।

বৃদ্ধাচারী মহম্মদ

মহম্মদের প্রথম বিবাহ হয় ২৫ বৎসর বয়সে। আর্যসমাজীদেরও এ কথা মানিতেই হইবে যে মহম্মদ তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগ শাস্ত্র অনুসারে কুমার অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন, বিবাহ করার পূর্ণ অধিকার তাঁহার ছিল।

সর্বপ্রথম আমরা মহম্মদের ব্রহ্মচর্য্য অবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা উচিত বিবেচনা করিতেছি। কারণ দুর্গন্ধময় মানসিকতার লোকেরা সর্বদাই ভালমানুষের অভ্যাস, কর্ম ও বাক্যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

আমরা মহম্মদকে ব্রহ্মচারী মান্য করি কারণ তিনি স্বয়ং এ বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন- একদা তিনি অন্য এক কুরেশী যুবকের সহিত পশুচারণ করিতেছিলেন। মহম্মদ ঐ যুবককে কহেন, "তুমি যদি আমার পশুগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারো তবে আমি ছুটি পাইতে পারি, আর যেভাবে নবযুবকেরা রাত্রিযাপন করিয়া থাকে আমিও সেইভাবে রাত্রিযাপন করিয়া আসিতে পারি।"

এই বলিয়া মহম্মদ মক্কা শহরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেখানে এক বিবাহ অনুষ্ঠানে তাঁহার মনযোগ আকর্ষন করিয়া লইল। তিনি সেখানেই ঢুকিয়া পড়িলেন এবং এক সময় ঘুমাইয়া পড়িলেন। পরে আরেক রাত্রে তিনি আবার একই উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলেন, কিন্তু স্বর্গীয় প্রলোভনে তাঁহার মন মোহিত হইয়া গেল এবং সেবারও তিনি ঘুমাইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিলেন।

মহম্মদ কহেন যে এই দুই ঘটনার পর আর তাঁহার মন মন্দের দিকে অগ্রসর হয়নাই।
"হায়াত মহম্মদী: ম্যোরসাহেব কৃত"

আমরা মহম্মদের বাক্যে বিশ্বাস করি, কারণ তাঁহাকে 'আলামীন' বলা হয়। আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁহার অন্তর সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত ছিল। মাত্র দুইবার শয়তান তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল কিন্তু ঐশ্বরিক প্রেরণার সহায়তায় আমাদের "রঙ্গিলা রসুল" সেই অন্ধকার রসাতলের পথ হইতে এক চুলের জন্য নিস্তার পাইয়াছিলেন। তিনি বাস্তবে কোনো অন্যায় কার্য্য করেন নাই (করিবার চিন্তা করিয়াছিলেন মাত্র)। মহম্মদ পূর্ণ ব্রহ্মচারী ছিলেন, তিনি ২৫ বৎসর বয়সকাল পর্যন্ত যৌবনের সকল বাসনা হইতে সুরক্ষিত ছিলেন।

মাতা খাদীজা

আমরা খাদীজাকে মাতা খাদীজা বলিয়াই উল্লেখ করিব, কারণ তিনি যখন মহম্মদের হারেমে আসিলেন তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর। সত্য কথা বলিতে গেলে মহম্মদই খাদীজার গৃহে গিয়াছিলেন। মহম্মদ ২৫ বৎসরের ছিলেন, দেখিতে-শুনিতে সুন্দর ছিলেন, স্বভাবে সৎ ছিলেন, কেবল সৎ বংশেরই নহে বরং সৎ গৃহেরও সন্তান ছিলেন। অন্যদিকে খাদীজা বিধবা ছিলেন, কুরেশী অর্থাৎ মহম্মদের স্বগোত্র ছিলেন, তাঁহার দুই পতি ইতিপূর্বেই গত হইয়াছিলেন, তাঁহার সন্তানও ছিল। তবুও মহম্মদ ও তাঁহার মধ্যে সম্পর্কের সূত্র এই ছিল যে তাঁহার নিকট সম্পত্তি ছিল। সওদাগরের দল যখন বিদেশে যাইত তখন তিনিও প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেন। প্রভুর আশীর্বাদে ব্যবসায়ে ১০০% হইতে ১৫০% অবধি লাভ থাকিত। সমগ্র মক্কা তাঁহাকে চিনিত। সুন্দর ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে বিবাহের প্রস্তাবও কম আসিত না। কিন্তু তিনি তাঁহার সম্পত্তি ও অবস্থায় সুখী ছিলেন, অকারণে আর জাগতিক সমস্যা মাথায় লইবার কোনো ইচ্ছা তাঁহার ছিল না।

এক বৎসর তিনি মহম্মদকে প্রতিনিধি করিয়া বণিকদলের সহিত পাঠাইলেন। মহম্মদ সৎ ছিলেন, আশার অতিরিক্ত লাভ করিয়া ফিরিলেন। বাড়ির ছাতে বসিয়া খাদীজা এক সুন্দর সওয়ারকে আসিতে দেখিলেন, তিনি ছিলেন মহম্মদ। মহম্মদ আসিলেন, ব্যবসার হিসাব দিলেন, নিজের প্রাপ্য লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার লাজুক নয়ন, পরিমিত বাক্য, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, ব্যবসায়িক দক্ষতা ও অন্তরের সরলতা বৃদ্ধার মনকে অতি স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত করিয়া ফেলিল, আর তিনি এই যুবককে জীবনসাথী করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

খাদীজা পবিত্র ছিলেন। লোকে তাঁহার সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তির পিছনে পড়িয়াছিল। এখন তিনি নিজেই পড়িলেন। এমন কে ছিল যে তাঁহাকে এইভাবে পড়িতে দেখিয়া বিচলিত হইবে না? এমন কে ছিল যে এই অবস্থায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে পারে!

খাদীজার পিতা জীবিত ছিলেন। আশঙ্কা ছিল তিনি এই বিবাহে কাঁটা হইবেন। এই সময়ে খাদীজা এক উৎসব করিলেন। তাহাতে নিজে পরিবার এবং মহম্মদের পরিবারকেও নিমন্ত্রন করিলেন। সুরার স্রোত চলিল। খাদীজার পিতাও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধকালে অতিরিক্ত পান করিয়া বেসামাল হইয়া পড়িলেন। সকলে এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে খাদীজাকে সাজাইয়া বিবাহ দেওয়া হইয়া গেল। জ্ঞান হইবার পর খাদীজার পিতা হতভম্ব হইয়া গেলেন, কিন্তু পক্ষী তখন উড়িয়া গিয়াছে। মিয়া-বিবি বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে আর সমাজের প্রধানেরা যখন মানিয়া লইয়াছেন তখন বৃদ্ধকে নিরব থাকিতে হইল।

"হায়াত মহম্মদী: ম্যোরসাহেব কৃত"

যাহা হউক, মহম্মদ বিবাহ করিলেন। মাতা খাদীজার পতি হইয়া তাঁহার জান-মাল এর অধিকারী ও রক্ষক হইলেন। বাল্যকালেই দরিদ্র হইয়াছিলেন। মাতার মমতা কোনোদিন পান নাই। এখন বিবাহ করিয়া ফেলায় এক সঙ্গে দুই বাসনা পূরণ হইয়া গেল। মহম্মদ যাহা ইচ্ছা বলুন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে মাতা খাদীজাই বলিব। তিনি আমাদিগের মাতা এবং আর্য্যশাস্ত্র অনুসারে প্রত্যেক নারীকেই মাতা বলা হইয়াছে।

ইহা মাতা খাদীজার তৃতীয় বিবাহ ছিল। মাতা খাদীজা মহম্মদের ছয়টি সন্তান জন্মদান করেন। তাহাদের মধ্যে দুইটি পুত্র এবং চারটি কন্যা ছিল। বড় পুত্রের নাম ছিল কাশেম, যে মাত্র দুই বৎসর বাঁচিয়াছিল। অন্য পুত্রটি নিতান্ত শিশুকালেই স্বর্গলাভ করে।

"সীরাতুল্লাভী: মৌলানা শাবলী কৃত"

চিকিৎসকেরা বলেন যে একজন মহিলা ৪০ বা ৪৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত সন্তানের জন্মদান করিতে পারেন। কিন্তু এত বয়সের সন্তান অধিক দিন জীবিত থাকে না। তাই সন্তানের জন্য বিবাহ করিতে হইলে এমন বয়সের নারীরা বিবাহের অযোগ্য। এই হিসাবে খাদীজা আদৌ বিবাহের যোগ্য ছিলেন না।

মহম্মদ একলা থাকিতেই অধিক ভালবাসিতেন। কল্পনার জগতে থাকিতেই আনন্দ পাইতেন। পাহাড়ে, জঙ্গলে, মাঠে বা মরুভূমিতে কিম্বা গৃহকোনেই একেলা বসিয়া নিজমনে কথাবার্তা কহিতেন। এই পাগলামি হইতেই তাঁহার পয়গম্বর হইবার সূচনা হয়।

রুজি-রুটির ব্যবস্থা না হইলে স্বাধীনতাই থাকে না, পয়গম্বরী ত অনেক দূরের কথা। খাদীজার সহিত বিবাহ ছিল এক দৈবিক প্রেরণা, যাহা হইতেই মহম্মদের সুসময়ের সূত্রপাত।

আরবে পাপ হইত। অতি ভয়ানক সব পাপ হইত, আর মহম্মদের অন্তর সৎ চিন্তায় পূর্ণ ছিল। আরবীয়রা মূর্তিপূজক ছিল আর মহম্মদ উন্মুক্ত প্রান্তরে, অসীম আকাশে অথবা ঘন বনে এক অলৌকিক শক্তির উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চিত হইয়াছিলেন যে পরমাত্মা এক এবং তাঁহার কোনো প্রতিমা নাই।

খাদীজার দাসদের মধ্যে জায়েদ নামক একজন ক্রীশ্চান ছিল। সে মহম্মদকে ক্রীশ্চান ধর্মের উপদেশ শুনাইয়া তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিত। জায়েদ এর প্রতি মহম্মদের স্নেহ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তিনি নিজের জন্য তাহাকে খাদীজার নিকট হইতে চাহিয়া লইলেন। খাদীজার আত্মীয়দের মধ্যে বেশ কিছু খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী ছিল। তাহারা মহম্মদকে নানাভাবে উৎসাহিত করিবার সব রকমে সাহায্য করিত।

মহম্মদ নিশ্চিত হইয়া গিয়াছিলেন যে জগতের লোকসকল পথভ্রষ্ট হইয়া চলিয়াছে। নিজের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার কান্না আসিত। তাঁহার অন্তরে গভীর ব্যথা ছিল, যাহা কখনো কখনো আরবী ভাষায় চমৎকার কবিতার রূপে প্রকাশিত হইত। ইহাই কোরানের প্রথম আয়াত। তাহা কোন কারণে কোরানের অন্তিমে লিখিত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। ইহাতে ব্যথা আছে, তীব্রতা আছে। কেবল যে সত্য আছে তাহা নহে, তীব্র আকাঙ্খা আছে ও বাস্তবের সন্ধান আছে।

মহম্মদের সাহস বৃদ্ধি পাইতেছিল। ধৈর্য্য রাখার কোনো উপায় তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন না। এই সময়ে তাঁহার মনে চিন্তা আসিল যে আত্মহত্যা করা উচিত। এই বেদনাময় জীবন রাখিয়া কোনো ফল নাই। এইখানেই খাদীজার বয়সের সুফল পাওয়া গেল। অল্পবয়সী কেহ হইলে মহম্মদকে পাগল মনে করিয়া ত্যাগ করিত। নিজেও ভয় পাইত, অন্যদেরও ভয় দেখাইত। খাদীজা মহম্মদকে শান্ত করিলেন। মহম্মদের ধারণা হইয়াছিল তাঁহার উপর জ্বীনের জাদু পড়িয়াছে। উহা ঐশ্বরিক জ্ঞান নহে বরং শয়তানের মায়া। খাদীজা তাঁহার জ্বীনের পরীক্ষা করাইয়া বুঝাইলেন যে উহারা জ্বীন নহে, দেবদূত। তাহাদের বার্তা বিশ্বাসযোগ্য। এর পর মহম্মদ যখন কহিলেন যে তিনি হয় জগতের পরিবর্তন করিয়া দিবেন অথবা এই প্রাণ আর রাখিবেন না; তখন খাদীজা জগতের পরিবর্তন করাই উচিত বলিয়া বুঝিলেন এবং মহম্মদের এই নূতন ধর্ম, যেটি প্রচার করিতে মহম্মদ ব্যগ্র ছিলেন তাহাতে প্রথম সহায়ক হইলেন।

"কসসুলম্বিয়া"

অনুবাদকের মন্তব্য: (মহম্মদ তবে সুইসাইডের ভয় দেখিয়ে খাদীজাকে ইসলামীকরণ করেছিলেন! কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ।)

ঐশ্বরিক জ্ঞানলাভকালে মহম্মদের বড়ই কষ্ট হইত। তাঁহার মুখে ফেনা আসিত, সর্বশরীর ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিত, এবং বহির্জগতের কোনো জ্ঞান থাকিতনা। অনেকেই ধারণা করিয়াছিল ইহা মৃগি রোগের লক্ষণ। সেসময়ে মহম্মদ অসুস্থ হইয়া পড়িতেন,

খাদীজাই তাঁহার সেবা করিতেন। তিনি মহম্মদের উপর কাপড় ঢাকা দিতেন ও জল ছিটাইয়া তাঁহার জ্ঞান উদ্ধার করিতেন।

মহম্মদ তাঁহার পয়গম্বরীর শিশুকাল খাদীজার কোলে কাটাইয়াছিলেন। সে কাহিনী যথেষ্ট দীর্ঘ। হইয়াছিল এই যে মহম্মদ নিজেকে প্রচলিত ধর্মও তাহার বিধি-ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং আপন ভক্তজনের প্রতিও সেসকল ত্যাগ করার উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। ইহাতে সকলে মহম্মদের বিরুদ্ধে চলিয়া যাইতেছিল এবং অনেকেই তাঁহার পরম শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। আরবের প্রথা ছিল ?হত্যার বদলে হত্যা?। সেখানে এক ব্যক্তি কাহাকেও হত্যা করিলে দুই বংশের মধ্যে অনন্ত শত্রুতার সৃষ্টি হইত এবং তাহারা একে অপরকে হত্যা করা ভিন্ন অন্য কোনো পথই দেখিতে পাইতনা। তবে মহম্মদের জন্য বাঁচার পথ ছিল। একতো তাঁহার পক্ষে ছিলেন চাচা আবুতালিব এবং অন্যজন ছিলেন খাদীজা। বালক হইতে বৃদ্ধ, সকলেই এই দুইজনকেই অতিশয় মান্য করিত। মহম্মদ সমস্যায় পড়িয়াছেন, দুঃখ পাইয়াছেন কিন্তু পত্নীভাগ্যে কখনো তাঁহার প্রাণশংসয় হয়নাই। অবশেষে মহম্মদ যখন ৫০ বৎসরের হইলেন তখন খাদীজার দেহাবসান হইল। অন্যদিকে চাচা আবুতালিবও পরলোকে প্রস্থান করিলেন। এইবার মহম্মদ অনাথ হইয়া পড়িলেন। বাধ্য হইয়া দেশত্যাগ করিয়া মদীনায় চলিয়া গেলেন। খাদীজা যে মহম্মদের জন্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তাহা পাঠক আশাকরি বুঝিয়াছেন। পরে মহম্মদের গৃহ সর্বপ্রকার পত্নীতে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহারা রূপেগুণে অনন্যা ছিলেন। সর্বপ্রকার আনন্দের ব্যবস্থা ছিল। শাসনক্ষমতা ছিল, অপ্রতিহত অধিকার ছিল। তথাপি মহম্মদ খাদীজাকে ভুলিতে পারেন নাই। এমনকি জীবিত আয়েশা অপেক্ষাও মৃতা খাদীজার প্রতি তাঁহার অনুরাগ অধিক ছিল।

২৫ বৎসর বয়স হইতে খাদীজা মহম্মদের রক্ষা করিয়াছেন। যতদিন তিনি মহম্মদের পত্নীরূপে জীবিতা ছিলেন ততদিন মহম্মদের মনে দ্বিতীয় বিবাহের চিন্তাও আসে নাই।

আর্য্যশাস্ত্র অনুসারে গৃহস্থাশ্রমের সময়কাল ২৫ বৎসর নির্ধারিত আছে। এই সময়টি মহম্মদ বড়ই পবিত্রতার সহিত অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাই আমরা তাঁহাকে আর্য্য গৃহস্থ বলিতে পারি।

খাদীজাকে বিবাহ করার পরিবর্তে মহম্মদ যদি তাঁহার পুত্র হওয়া স্বীকার করিয়া লইতেন তবে তাহা আর্য্যশাস্ত্রসম্মত হইত। এক মুসলমান মৌলানা সাহেব এর সহিত আলোচনাকালে যখন আমরা এই কথা কহিলাম তখন তিনি আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "হাঁ, ভাই ও হওয়া যাইত।" আমি জানাইলাম "হাঁ, হিন্দুস্তানে এমন প্রথাও আছে যে কোনো বয়স্কা মহিলার ভাই হইয়া সন্তানবৎ কর্তব্যপালন করা যায়।" সেক্ষেত্রে আমরা তাঁহাকে ভগ্নী খাদীজা বলিতে পারিতাম। তথাপি জ্ঞান, বুদ্ধি, বয়স ও অভিজ্ঞতায় তিনি মাতা খাদীজাই ছিলেন।

পুত্রী আয়েশা

খাদীজার দেহত্যাগের পর তিন মাসও অতিক্রান্ত হয় নাই, মহম্মদ অনুভব করিলেন যে এ জগতে পত্নী অপেক্ষা প্রিয় আর কিছুই নাই। সমস্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল, গৃহে কোনো আনন্দ ছিল না। মহম্মদ দ্বিতীয় পত্নীর সন্ধান আরম্ভ করিলেন। মাতা সুদা (সওদা) সুকরাণ এর পত্নী ছিলেন তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী মুসলমান হইয়াছিলেন এবং এই অপরাধের জন্য ভালরকম শাস্তিও পাইয়াছিলেন। আরব নিবাসীদের জ্বালায় তাঁহাদিগকে আপন দেশ মালুফ কে বিদায় জানাইয়া বিদেশে বাস করিতে হইত। মহম্মদ যখন বিধর্মীদের সহিত সন্ধি করিয়া লইলেন ও তাহাদের মূর্তিগুলিকে মানিয়া লইলেন (আবার পরে সেই সন্ধি হইতে সমস্যা দেখিয়া প্রথমবামের কথাগুলিকে শয়তানের বার্তা বলিয়া বাতিল করিয়াছিলেন) তখন অন্য সব বিতাড়িতদের সহিত সুকরাণ ও সুদাও ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিবার পরেই সুকরাণ এর মৃত্যু হইল। সুদা বিধবা হইলেন। তিনি সত্যের জন্য দেশত্যাগী হইয়া এত কষ্ট ভোগ করিয়াছেন তাঁহার সততার আর কি প্রমাণ প্রয়োজন! একদিকে আপন পতির প্রতি বিস্বস্ত, অন্যদিকে ধর্মের জন্য প্রাণত্যাগে প্রস্তুত, এমন পত্নী লাভ করা মহম্মদের পক্ষে যথেষ্টই কঠিন ছিল। বিধাতার আশীর্বাদে তিনি বিবাহ করিয়া লইলেন। বৃদ্ধের পক্ষে বিধবা বিবাহ করার মধ্যে সমস্যার কিছুই ছিল না। একে অন্যের প্রেমের সম্মান করিতে পারিতেন। খাদীজার স্থান আর কে লইতে পারিত! কেবল সুদাই একমাত্র আশা ছিলেন, তাহাও পুরণ হইল। গৃহ আর শুন্য রহিল না।

আমরা উপরেই বলিয়া আসিয়াছি যে মহম্মদ ২৫ বৎসর একই পত্নীর সহিত অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহাও আবার দুইবারের বিধবা। বিবাহকালে তিনি ছিলেন ৪০ বৎসরের। মৃত্যুকালে বয়স ছিল ৬৫। এই বুড়ীর সহিত যে যুবা মহম্মদ টিকিয়া ছিলেন ইহাই মহম্মদের পবিত্রতার সাক্ষ্য দেয়। অন্য সকল পুরুষকে পুণ্যের পথে উৎসাহিত করে, সমস্যায় সমাধান দেয়, বিপদে ধৈর্য বৃদ্ধি করে, হৃদয় প্রশস্ত করে, আত্মার শক্তি বৃদ্ধি

করে। এখনও জগতে অনেক মানুষ আছে যাহারা নারীর সৌন্দর্যের চিত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে পূজনীয় দেবী বানাইয়া রাখে। পবিত্রতার মূর্তি বানাইয়া কল্পনার আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। এই কল্পনার প্রেম তাহাদের হৃদয়ে অবোধ্য রহস্যের সৃষ্টি করে।

মহম্মদ সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু খাদীজার ক্ষেত্রে বলিতে হয় শালী বুড়ী বয়সে বিবাহ করিয়া (মহম্মদকে) কচি মেয়ের সুখ পাইতে দিল না। ইহাতে আর এক সুফল ফলিয়াছিল। জগতের সকল নারীর চিন্তা দূর হইয়া গিয়াছিল, স্বর্গের হূর পরীর কল্পনা আসিয়া সেই স্থান পূরণ করিত। পরে মহম্মদের যখন ধারাবাহিক বিবাহ হইতে লাগিল তখন আর হূর পরীর সৌন্দর্য্য বর্ণনার মধ্যে সেই তীব্র উষ্ণতা দেখা যায় না, যাহা খাদীজার জীবিতকালে থাকিয়া থাকিয়া কোরানের আয়াতে পরিস্ফুট হইত, সৌন্দর্য বর্ণনায় প্রধান স্থান লইত। অর্থাৎ বাহ্যিক দেহবর্ণনায় যাহা নিহিত আছে, এই প্রকার গৌরবর্ণ কুমারী বালিকা, প্রশস্ত নয়ন, উন্নত বক্ষ, ইত্যাদি।

বাস্তবিক; নারীর প্রকৃত সদগুণ তাহার কুমারীত্ব। মহম্মদ কুমারীও বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম আয়েশা। তিনি ছিলেন হজরত আবু-বকর এর কন্যা। আবু-বকর ও মহম্মদ বাল্যসখা ছিলেন। তাঁহাদের বয়সও ছিল প্রায় সমান; মাত্র দুই বৎসরের পার্থক্য ছিল। মহম্মদ আবুবকর অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় ছিলেন। আবুবকর অতি শীঘ্রই মহম্মদের প্রতি প্রশ্নহীন বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। আয়েশা তাঁহার প্রাণপ্রিয় ছিল। সেইসময়ে আয়েশার বয়স ৬ কি ৭ বৎসর ছিল।।

মহম্মদ এই নাতিনীর বয়সী বালিকার প্রতি নজর দিলেন কেন? অনেকেরই ধারণা যে আবু-বকর এর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। প্রথমতঃ তো আবু বকর মহম্মদের ধর্মের প্রতি আগেই বিশ্বাস আনিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে খোদার রসুল স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, অর্থাৎ মহম্মদের বাক্যকে তিনি ঈশ্বরের বাক্য মানিতেন। কাজেই এই ধরণের ব্যক্তিগত আত্মীয়তার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। তবুও ধরা যাক,

কখনো যদি এই বিশ্বাসের সম্পর্ক দুর্বল হইয়াও পড়িত তবে তাহা মজবুত করিবার সর্বাধিক সভ্য পন্থা এই ছিল যে মহম্মদ আবুবকর এর কন্যাকে নিজ কন্যা করিয়া লইতেন, নিজহস্তে তাহার বিবাহ দিতেন, তাহার বিবাহে যৌতুক প্রদান করিয়া পিতার স্থান গ্রহণ করিতেন। কিন্তু আরববাসীরা এই প্রকার মোটাদাগের সম্পর্ক ব্যতীত আর কোনো ভদ্রসভ্য সম্পর্কের খবর রাখিত না।

"সৈয়দ আমীর আলি" লিখিয়াছেন যে আরবে কোনো নারী কেবল পত্নী সম্পর্ক ব্যতীত কোনো পরপুরুষের নিকট বাস করিতে পারিত না। মহম্মদ তাঁহার রাজনৈতিক প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া ধারাবাহিক বিবাহ করিয়াছিলেন। আহা! প্রিয় ভারত!! পবিত্রতার নক্ষত্র ভারত!!! প্রাচীন আর্যদের প্রাচীন সভ্যতার ভারত!!!! ঔরঙ্গজেব এর পৌত্রী সফিউন্নীসাকে দুর্গাদাস আপন কন্যা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, গোলেদারীর আসীর শাহজাদী, যিনি লুটের মাল হিসাবে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে শিবাজী আপন কন্যা মানিতেন।

তবে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আয়েশা অতি কোমল ও লঘুশরীর ছিলেন, তাই পালকী তুলিবার সময় তিনি ভিতরে আছেন কিনা তাহা বুঝিতেই পারা যায় নাই। আয়েশা সেখানেই অসহায় বসিয়া রহিলেন। এই বুঝি কেহ লইতে আসিল, এই বুঝি কেহ আসে, এই প্রতীক্ষায় প্রভাত হইয়া গেল, কেহই আসিল না। ভাগ্যক্রমে সাফবান তাহার ঊট লইয়া সেই পথে যাইতেছিল। আয়েশাকে দেখিয়াই সে চিনিতে পারিল এবং কোনো কথাবার্তায় না গিয়া আয়েশার সামনে নিজের ঊট বসাইয়া দিল। আয়েশাও একলাফে তাহাতে চড়িয়া বসিলেন। এইভাবে একরাত্রি পার করিয়া তিনি প্রিয় মহম্মদের সহিত মিলিত হইলেন।

এখন এই অবস্থায় কে কাহার মুখ বন্ধ করিত! নানাপ্রকার কথাবার্তা শুরু হইয়া গেল। ধীরে-ধীরে মহম্মদও আয়েশার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এ অবস্থায় বেচারী আয়েশা

আর কোনো উপায় না দেখিয়া আপন পিতা-মাতার নিকট চলিয়া গেলেন। মাতা তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিবার যন্য যত্ন করিতেন, কিন্তু তাহাতে আয়েশার মনের দুঃখকষ্ট দূর হইত না।

এই ঘটনা লইয়া মহম্মদের বন্ধু ও শত্রুদের মধ্যে বহুপ্রকার মতামতের জন্ম হইতে আরম্ভ করিল। মহম্মদের নামে কলঙ্ক লাগিয়াছিল, তাঁহার প্রতাপও পূর্বের ন্যায় রহিল না। অবশেষে তিনি আলি ও ওসমান এর নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন। আলি জানাইলেন এ ব্যাপারে আয়েশার দাসীকে প্রশ্ন করা উচিত। পরামর্শ উপযুক্তই ছিল, কিন্তু তাহার ফল আলীর জন্য মারাত্মক হইয়াছিল। আয়েশা এই স্পর্ধা জীবন ভুলিতে পারেন নাই যে মহম্মদের জামাতা হইয়া আলী কিনা শাশুড়ীর উপর সন্দেহ করে! আলীর সহিত আয়েশার ভয়ানক শত্রুতা জন্মিল।

মহম্মদের কন্যা ফতেমা, মাতা খাদীজার স্মৃতি ফতেমার সহিত আলীর বিবাহ হইয়াছিল। একদিকে প্রিয় জামাতা আলী, অন্যদিকে প্রিয় পত্নী আয়েশা। বেচারা মহম্মদ কোন দিকে যাইতেন! গৃহযুদ্ধের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া গিয়াছিল। মহম্মদের মৃত্যুর পর ইসলামের ইতিহাস অন্তহীন রক্তপাতের ইতিহাস। খিলাফতের জন্য এই রক্তপাত হইত না যদি সেদিন আলী ও আয়েশার মন নির্মল হইত, যদি তাঁহারা এই শত্রুতা ভুলিয়া যাইতেন।

বহুবিবাহকারীরা অবধান করুন, যেখানে পয়গম্বরের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে, এমন মহান ব্যক্তিও আপন ভুলের ও কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতে বাধ্য হন, সেখানে আপনারা এমন কে যে কর্মফল হইতে নিজেকে সুরক্ষিত বলিয়া মনে করেন? দশরথের গৃহ ধ্বংশ হইয়া গিয়াছিল, মহম্মদের ধর্ম বিনষ্ট হইয়া গেল, কিসের জন্য? কারণ তাঁহারা বৃদ্ধকালে নবযুবতী (কুমারী) বিবাহ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ আয়েশার কক্ষে গিয়া তাঁহার পিতামাতার সমক্ষেই তাঁহার নিকট সমস্ত ইতিহাস জানিতে চাহিলেন। সেই সময় আয়েশার পিতামাতা কন্যাকে কহিলেন, "যদি তুই অন্যায় করিয়া থাকিস তবে তওবা কর। আল্লাহ দয়ালু রক্ষাকর্তা। আর যদি তুই নির্দোষ হইয়া থাকিস তবে তাহাই প্রকাশ কর।"

আয়েশা কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া উত্তর করিলেন, "ধৈর্যই আমার উত্তর, পরমাত্মাই আমার সহায়। যদি আমি নিজেকে নির্দোষ বলি তবে কেহ মানিবে না, তওবা করিব কি অপরাধে? পরমাত্মা জানেন আমি নির্দোষ।"

মহম্মদ মনে মনে আয়েশার চাল-চলন জানিতেন। তিনি বিশ্বাস করিয়া লইলেন কিন্তু লোকজনকেও তো বিশ্বাস করাইবার প্রয়োজন ছিল! অবশেষে তিনি নিজের ঐশ্বরিক জ্ঞানের শরণাগত হইলেন। মুখে কাপড় চাপা দিয়া কিছুক্ষণ দৃশ্যতঃ জ্ঞানহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। অতঃপর কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে উঠিয়া ঘোষণা করিলেন- "আয়েশা! আনন্দ করো। আল্লাহ তোমার নির্দোষিতার সাক্ষ্য দিয়াছেন।"

আয়েশার হারানো সৌভাগ্য ফিরিয়া আসিল, কিন্তু নিন্দাকারীদের হইল সর্বনাশ। একের পর এক ঐশ্বরিক বাণী আসিতে লাগিল। নিন্দাকারীদের উপর তিরষ্কার বৃষ্টি হইতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের জন্য শাস্তি ধার্য্য হইল যে তাহাদের ৮০-৮০ চাবুক লাগানো হউক। পুরুষদের মত নারীদের উপরেও চাবুক চালানো হইল।

সুরা 'আল-নূর' এ রসুল ও তাঁহার ঈশ্বরের দুঃখ ও ক্রোধ এখনও লিখিত আছে। দূর্ভাষীদের মুখ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এখন প্রয়োজন ছিল 'হারেম' এর; কারণ তালি বাজাইতে দুই হস্তই প্রয়োজন। আল্লামিঞা এই আবেদনও মঞ্জুর করিয়া দিলেন এবং সুরা 'আহযাব' অবতীর্ণ হইল-

"হে পয়গম্বরের পত্নীগণ, তোমরা অন্য নারীদের ন্যায় নও। যদি তোমাদের হৃদয়ে ধর্মের ভয় থাকে তবে কথাবার্তায় কোমলতা প্রদর্শন করিও না, যাহাতে দুষ্টাত্মারা প্রলুব্ধ হয়। সেটুকুই বলো যা প্রয়োজনীয় ও মর্যাদাপূর্ণ।"

"আর তোমরা আপন গৃহে অবস্থান করো, অন্ধকার যুগের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় আপন সৌন্দর্য্যের প্রদর্শন করিয়া বেড়াইওনা।"

আসলে মহম্মদ তাঁহার পত্নীদের উপর জোর জুলুম, বকুনি ইত্যাদির বিরুদ্ধে ছিলেন। আল্লামিঞা সকলের গুরুজন ছিলেন। তাঁহাকেই মধ্যে টানিয়া আনিলেন এবং নিজে যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা আল্লাকে দিয়া ঐশ্বরিক বচন হিসাবে বলাইলেন। ইহাতে আয়েশা ও মুহম্মদের আবার মিল হইয়া গেল আর আয়েশার তো গৃহে রাজত্ব চলিতে লাগিল। কিন্তু ইহার পরে আর কোনো যুদ্ধের বেলায় আয়েশাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া হয় নাই।

ইহার পরে আয়েশার দর্শন শেষ দর্শন ছিল। যাহা তাঁহার পতির মৃত্যুশয্যায় হইয়াছিল। মুহম্মদ তাঁহার শেষবারের রোগশয্যায়; যাহা মারণরোগ প্রমাণিত হইয়াছিল, আয়েশার নিকট থাকিবার অনুমতি বিবিদের নিকট আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। সেই গৃহেই প্রায়ই ঐশ্বরিক আয়াত অবতীর্ণ হইত। সেই খাটিয়া ছিল, সেই বিছানা-বালিশ। এই গৃহ মুহম্মদের সবচেয়ে প্রিয় ছিল।

রোগগ্রস্ত অবস্থায় মুহম্মদ কবরস্থান গেলেন এবং মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া ঘরে ফিরিলেন। আয়েশাও সেই সময়ে শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং 'মাথা গেল, মাথা গেল' বলিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন।

মুহম্মদ বলিয়া উঠিলেন, "আয়েশা, ইহা তো আমার বলার কথা।" এ শুনিয়াই আয়েশা চুপ হইয়া গেলেন। মুহম্মদের তখন তামাশা করার ইচ্ছা হইল। তিনি কহিলেন, "আয়েশা! তোমার মৃত্যু আমার আগে হইলে কি তোমার ভাল মনে হয় না? তাহা হইলে

আমি তোমাকে নিজহস্তে কবর দিয়া তোমার জন্য প্রার্থনা করিতে পারি।" আয়েশা নাক উঁচু করিয়া উত্তর করিলেন- "এসব অন্য কোথাও শুনাইও। আমি জানি, তুমি আরো সুন্দর পুতুল (বিবি) আনিবার মতলব করিতেছ।"

বেচারা মুহম্মদ আর কি বলিতেন! তর্ক করার শক্তি ছিল না, মুচকি হাসিয়া চুপ থাকিতে হইল।

"হায়াত মোহম্মদী: ম্যোরসাহেব কৃত"

পাঠক অনুমান করিতে পারেন যে নবযুবতী বিবিকে পশ্চাতে ছাড়িয়া যাইতে মুহম্মদের কিরূপ টেনশন হইতেছিল। কিন্তু হায়! এই বাস্তব জগত বড়ই কঠোর, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। মসজিদের আঙিনায় বিশ বৎসরের পত্নী তাহার ৬২ বৎসরের পতির মস্তক কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। মুহম্মদ তাহার চিবাইয়া দেওয়া দাঁতন মুখে লইতে লইতে এই ক্ষণিকের শরীর ত্যাগ করিলেন। এরপর আবুবকর আয়েশাকে বলিয়াছিলেন "মহম্মদের জন্য আমার দুঃখ নাই, কিন্তু মাত্র ২০ বৎসরে বিধবার রূপ যৌবন, আশা ভরসা সকলই শেষ হইল। ইহাতে কোন পিতা অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারে!"

সদা সোহাগিনী

আবু বকর যেমন হজরত মহম্মদ সাহেবের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন তেমনই ওমর ছিলেন বাম হাত। আবুবকর এর ন্যায় তিনি সহজে মুসলিম হইতে স্বীকার করেন নাই, কিন্তু যখন হইলেন তখন পূর্ণ বিশ্বাসের সহিতই হইলেন। এই ধর্মের জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

আবু বকর উদার মনের বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। অন্যদিকে ওমর অধিক আবেগপ্রবণ ছিলেন। সহজেই তাঁহার মাথাটি গরম হইয়া যাইত। সেই সময়ে তাঁহাকে সামলানো বড় সহজ ছিল না। তাঁহার কন্যা "হাফসা" পিতার নিকট হইতে এই গুণটি লাভ করিয়াছিলেন। তিনিও কাহারো কথা কানে তুলিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। 'খানীস' এর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল যিনি যুদ্ধে (গজওয়া বদর) নিহত হইয়াছিলেন। বেশ কিছুদিন বিধবা থাকার পরও কোনো মুসলমান তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইল না। তখন ওমর প্রথমে আবুবকর এর সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন কিন্তু আবুবকর রাজী হইলেন না। ওমর তখন ওসমান কে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনিও সম্মত হইলেন না। কারণ হাফসা কে সামলানো কোনো সামান্য ব্যাপার ছিল না। ইহাতে ওমর এর মাথা গরম হইয়া গেল আর তিনি মহম্মদের নিকট হাফসা কে বিবাহ করার প্রস্তাব লইয়া গেলেন। মহম্মদ মেহেরবানি করিয়া তাহাকে আপন স্ত্রী হিসাবে মঞ্জুর করিয়া লইলেন। এইভাবে আবু বকরের সহিত যেমন আত্মীয়তা ছিল, ওমরের সহিতও সেইরূপ হইল। দুইজনেই পরম বিশ্বস্তভাবে ইসলামের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং আপন কন্যাদের সুবাদে মহম্মদের গুরুজন হইয়া গেলেন। এই রকমই বদর যুদ্ধের আর এক শহীদ উবাইদা-র স্ত্রী ছিল জৈনব। সম্পর্কে উবাইদা মুহম্মদের ভাই ছিলেন। (আল-মুত্তালিব বংশের সন্তান।) তাঁহার বিধবা পত্নীর সহিতও মুহম্মদ শাদী

করিয়া লইলেন। জৈনব বড়ই সুন্দর শরীর-স্বাস্থ্য পাইয়াছিলেন এজন্য তাঁহাকে "আম্মুল্মসাকীন" বলা হইত।

আবু সাল্লামা প্রথম দিকের মুসলমানদের মধ্যে ছিলেন। "হবস" (হাবাশা) হিজরতের সময়ে তাঁহাকে আরব ছাড়িতে হইয়াছিল। পরে মুহম্মদ যখন মদীনায় ডেরা পাতিলেন তখন তিনিও সেখানে ফিরিয়া আসিলেন। 'উহুদ' এর যুদ্ধে তিনি আহত হইয়াছিলেন কিন্তু প্রায় সুস্থও হইয়া উঠিয়াছিলেন। যখন "বনি-সাদ" গোত্রের উপর মুসলিমেরা চড়াও হইল তখন তাঁহাকে সেনাপতি বানানো হইয়াছিল। দুর্বল শরীর লইয়া যুদ্ধ করিতে গিয়া তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। আপন আত্মীয়দের প্রতি মহম্মদের সহানুভূতি ছিল, তিনি উহার বিধবা 'হিন্দ' এর নিকট যাতায়াত করিতেন। বৃদ্ধা হইলেও হিন্দ সুন্দরী ছিলেন। মহম্মদ তাহাকে শাদী করিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন তখন তিনি বৃদ্ধ হইবার বাহানা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু মহম্মদ কহিলেন "আমারও কিছু কম বয়স হয়নাই।" ইহার পর হিন্দ তাঁহার বালবাচ্চার কথা তুলিলে মহম্মদ তাহাদেরও দায়িত্ব লইতে সম্মত হইয়া গেলেন এবং বুড়ীকে রাজী করাইয়া ঘরে আনিলেন। মদীনা মসজিদের সংলগ্ন ৫ কুঠুরী গৃহ সেসময়ে নির্মিত হইয়াই গিয়াছিল। এক-এক কামরায় মহম্মদের এক-এক বিবি থাকিতেন। মহম্মদ পালাক্রমে এক-এক রাত, এক-এক দিন একএক বিবির সহিত কাটাইতেন। শেষ কামরাখানি ছিল হারিশ এর। যখনই মুহম্মদের ঘরে কোনো নূতন বিবি আসিতেন, তাঁহাকে হারিশ এর কামরায় তোলা হইত। হারিশ এর জন্য নূতন কুঠুরী বানাইয়া দেওয়া পড়িত। সে বেচারী চুপচাপ আলাদা ব্যবস্থা করিয়া লইত। একবার মুহম্মদ স্বয়ং লজ্জিত হইয়া বলিয়াছিলেন "হারিশ কি বলিবে!"।

রাঃ আঃ সৈয়দ আমীর আলি ফরমাইয়াছেন যে এইসব বিধবারা, যাহাদের মুহম্মদের বিবি হইয়া অহঙ্কার হইয়াছিল তাঁহারা অসহায় ছিলেন। তাঁহাদের পতি ইসলামের সেবা করিতে করিতে শহীদ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের যাহাতে দিন গুজরাণ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা মুহম্মদের কর্তব্য ছিল। কার্য্যটি জরুরী ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার

নিজের দিন গুজরানেই প্রথম হইতে টানাটানি চলিত। তাহার উপর তিনি নিজের রুজিরুটির উপর নূতন বোঝা চাপাইয়া খরচের বহর আরো বাড়াইয়া ফেলিলেন। অন্যদিকে আমদানী সেই আগের মতই রহিল। এক এক দেশের এক এক রেওয়াজ। হয়ত হজরৎ আমীর আলির কথাই সত্য। আরব দেশে মুহম্মদের সময়ে কোনো নারী অন্য পুরুষের নিকট কেবল পত্নী হিসাবেই থাকিতে পারিত। নতুবা হিন্দুস্থানের প্রথা তো এই যে ধর্মাত্মারা পরনারীকে ধর্মভগ্নী বানাইয়া লইতেন। ইহাতে তাহাদেরও দিনাতিপাতের উপায় হইয়া যাইত আবার ধর্মরক্ষাও হইত। হয়ত সমস্ত মুসলমানের মধ্যে বিধবাদের পালনকর্তা আরকেহই ছিলনা। হয়ত কোনো কুমার অথবা বিপত্নীক ঐসব বিধবাদিগকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত ছিলনা। দয়ার সাগর একমাত্র মুহম্মদই ছিলেন। আমাদের তুচ্ছ বুদ্ধিতে তো মহম্মদ তাহাদিগকে ধর্মভগ্নী মানিয়া লইলেও কাজ চলিত। অথবা যদি বিবাহই দিতে হয় তবে কোনো কুমারের সহিত দেওয়া যাইত। আপন আপন ধর্মের ব্যাপার, হয়ত মহম্মদের এই পথই ভাল বোধ হইয়াছিল যে বিবিতে গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া লইবেন। ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ আর ৫-৫ জন বিবি! যাহাহউক, বিবি লইয়া কামকাজ নিশ্চয় ভালই চলিত। দিন-রাত মৌজেই কাটিত। বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা চিরকালীন ঘটনা।

পুত্রবধু সমাচার

আমরা আগেই বলিয়াছি যে জায়েদ নামে খাদীজার এক ঈশাঈ গোলাম ছিল। সে মহম্মদের ধর্মীয় ও মানসিক সমস্যায় নানাভাবে সমাধান করিত। এজন্য উহার প্রতি মহম্মদের বিশেষ প্রীতি ছিল। খাদীজা এই গোলামটি মহম্মদকে দান করিয়াছিলেন এবং মহম্মদ তাহাকে নিজের পুত্র বানাইয়া লইয়াছিলেন। জায়েদ ও মহম্মদকে অত্যধিক ভালবাসিত। একবার তাহার আপন পিতা তাহাকে লইতে আসিলে সে যাইতে সটান অস্বীকার করিয়াছিল। মহম্মদ রসুলও ছিলেন আবার বাপও ছিলেন, সে শুধুই বাপের নিকট থাকিয়া কি করিত! উহার প্রথম বিবাহ "উম্মে আয়মন" এর সহিত হইয়াছিল, যাহার বয়স ছিল জায়েদ এর দ্বিগুণ। কিন্তু বাপ মুহম্মদ পাত্রীটি পছন্দ করিয়াছিলেন ফলে বাধ্য হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে হইয়াছিল। তাহাদের একটি পুত্র জন্মাইয়াছিল। তাহার নাম ছিল "ওসামা"। জায়েদ এর দ্বিতীয় বিবাহ হয় জয়নব এর সহিত। জয়নব কুরেশী বংশের ছিল এবং মহম্মদের পিস্তুতো সম্পর্কের ভগ্নী ছিল। একদিন মহম্মদ জায়েদ এর অবর্তমানে তাহার ঘরে গিয়া পড়িলেন। জয়নব পর্দার আড়াল হইতে রসুলের (আবার শ্বসুরও বটে) গলা পাইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহাকে ভিতরে ডাকিল। মহম্মদের নজর তাহার সুন্দর চেহারায় পড়িল। আর কী বাকি থাকে? তাঁহার দিলের মধ্যে কারেন্ট লাগিয়া গেল আর মুখে বাহির হইল- "সোভান-আল্লা! তোমার সৃষ্টি কতই না সুন্দর!"

জয়নব তাহা শুনিয়া ফেলিল এবং মনে মনে পয়গম্বরের হৃদয় জয় করিয়া খুশী হইয়া উঠিল। জায়েদকে সম্ভবতঃ তাহার পছন্দ ছিল না। যতই মহম্মদের পুত্রতুল্য হোক না কেন, আসলে তো ছিল সে গোলামই!

জায়েদ যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল, জয়নাব তাহাকে ঘটনা জানাইয়া দিল। ইহার পর যাহা হইল তাহাকে আপনারা মহম্মদের বিবাহের কথাবার্তা বুঝিবেন কিনা তাহা আপনাদের ব্যাপার। কিম্বা হয়ত জায়েদ জয়নবের উপর পূর্বেই চটিয়া ছিল। যাহাই হউক সে এক দৌড়ে মহম্মদের নিকট গিয়া হাজির হইল আর নিজের বিবিটিকে যাহাকে দেখিয়া মহম্মদ মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহাকে তালাক দিবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু মহম্মদ তাহাকে বুঝাইয়া কহিলেন, "সুখে শান্তিতে সংসার করো"। কিন্তু যে বিবি অন্যের দিকে টান দেখাইতেছে তাহাকে লইয়া সংসার করার ইচ্ছা জায়েদ এর ছিল না। সে জয়নবকে তালাক দিয়াই ফেলিল। আর জয়নব তখন মহম্মদের খিদমতের আশায় তাঁহার পিছনে লাগিয়া গেল। বদনামের ভয়ে মহম্মদ ইহাতে সম্মত হইতে পারিতেছিলেন না। সেই সময়েই ঐশ্বরিক বাণী আসিয়া সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া দিল।

আল্লা মনুষ্যকে দুইটি হৃদয় দেন নাই তেমনই পোষ্যপুত্রকে তোমার পুত্রও করেন নাই। যাহা তুমি বলিয়াছ তাহা তোমার মুখের কথা মাত্র, কিন্তু আল্লাহ প্রকৃত সত্য জানেন ও সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। তিনি ইচ্ছা করেন যে মনুষ্য তাহার প্রকৃত পিতার নামেই পরিচিত হউক। আর যখন তুমি বলিয়াছ "বিবি লইয়া সুখে সংসার করো" তখন তুমি সত্য গোপন করিয়াছ যে সত্য প্রকাশ করাই আল্লার ইচ্ছা ছিল। ভয় করিয়ো না, জায়েদ যখন তালাক দিয়াছে তখনই আমরা মুহম্মদের সহিত বিবাহ দিয়াছি, যাহাতে মোমিনেরা তাহাদের পোষ্যপুত্রের বিবিকে বিবাহ করিতে পারে। নিয়ম অনুযায়ী তালাক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং আল্লার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।-- সুরা আহযাব ৪-৫ --

মহম্মদ তোমাদের কাহারও পিতা নহেন তিনি আল্লার রসুল এবং "খাতিমুল্মরসলীম"। আর আল্লা সবকিছু অবগত।

এসব কথা এইজন্য লিখিত হইল যাহাতে মহম্মদের অন্তরমন সম্পর্কে পাঠক জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। জয়নবকে বিবাহ করিতে মহম্মদ মুখে অস্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে প্রেমের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এমনও বলিতে পারেন যে অগ্নি সর্বদাই জ্বলিয়া থাকিত। তাহাই ঈশ্বরের বাণীরূপে প্রকাশিত হইয়া গেল। আর তারপর মহম্মদ জয়নবের নিকট বার্তা পাঠাইলেন-

"আল্লাহ তোমাকে আমার সহিত মিলাইয়া দিয়াছেন। তাই আর বিবাহের কোনো প্রয়োজন নাই।"

আল্লা যেখানে মনের মিলন করিয়া দিয়াছেন সেখানে মৌলভী-কাজী দের নাক গলাইয়া বিবাহ দেওয়া নিরর্থক। তাই আরো বলা হইল-

"আল্লাহ স্বয়ং বিবাহ দিয়াছেন এবং জিব্রাইল তাহার সাক্ষী" [তাফসীর হুসনী আয়াত মজকর খূরা জমকুর], "আর বিবাহের জন্য এই দুটি ছাড়া অন্য কি প্রয়োজন?"

রঙ্গীলা রসুল এর এই কাহিনী বড়ই বিচিত্র। পুত্র পুত্র রহিল না, পুত্রবধু পুত্রবধু রহিল না।

পাঠক এইবার বুঝিতে পারিবেন কেন মহম্মদ কাহারো সহিত মাতা, কন্যা অথবা ভগ্নী পাতাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যেখানে পাতানো পুত্রেরই সহিত সম্পর্ক রহিল না, যেখানে তাহার বিবিও মহম্মদের জন্য হালাল হইয়া গেল, সেখানে পাতানো মাতা-কন্যা-ভগ্নীরা কিভাবে নিস্তার পাইত?

সেই সময়ের মুসলমানেরা কিন্তু চুপ ছিল না। ইতিহাস বলে মহম্মদ কাজটি ভাল করেন নাই। তাঁহার আসমানী আয়াত, আল্লা, জিব্রাইল সকলের উপরেই লোকে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন নহে যে মহম্মদ নিজের দোষ বুঝিতেন না। বরং তিনি ভালই জানিতেন যে সেদিন যদি তিনি জায়েদের গৃহে না যাইতেন এবং বেপর্দা জয়নবকে না

দেখিতেন তবে এইভাবে দিন দুপুরে অন্ধকার নামিত না। যাহা হউক সে সব তো ঘটিয়াই গিয়াছিল, তাহার পর কি হইল দেখা যাক!

মহম্মদ এইবার নিজের হারেমখানি লইয়া চিন্তায় পড়িলেন। লোকে সর্বদাই তাঁহার গৃহে আসিত। তাঁহার বিবিদের সহিত কথাবার্তা কহিত। পয়গম্বরের যাহা হইয়াছিল তাহা অন্য কোনো মুসলমানের উপরেও ঘটিয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল না। জায়েদের বিবি জয়নব যাহা করিতে পারে মহম্মদের কোনো বিবিও সাহস করিয়া তেমন কিছু করিয়া ফেলিতে পারিত। ইহার ব্যবস্থা সময়মত করার প্রয়োজন ছিল। এইসব চিন্তা করিয়া মুহম্মদ আকাশপানে তাকাইলেন এবং আল্লার দরবারের ঘন্টী বাজাইয়া দিলেন। অমনি কাজ হইয়া গেল, আয়াত নামিয়া আসিল।

হে মুমিনগণ!! রসুলের গৃহে প্রবেশ করিও না। তোমাদের যাহা জানিবার থাকে তাহা পর্দার আড়াল হইতে প্রশ্ন করিও। ইহাই তোমাদের ও তাঁহার হৃদয়ের জন্য সর্বোত্তম। আর তোমাদের জন্য কখনোই উচিত নয় যে তোমরা রসুলের মনে দুঃখ দাও বা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিবিদের সহিত বিবাহ করো। রসুলের বিবিরা তোমাদের মাতা।

হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো, তবে অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্যকথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।

O you who believe! Enter not the Prophet's houses, except when leave is given to you for a meal, (and then) not (so early as) to wait for its preparation. But when you are invited, enter, and when you have taken your meal, disperse, without sitting for a talk. Verily, such (behaviour) annoys the Prophet, and he is shy of (asking) you (to go), but Allâh is not shy of (telling you) the truth. And when you ask (his wives) for anything you want, ask them from behind a screen, that is purer for your hearts and for their hearts. And it is not (right) for you that you should annoy Allâh's Messenger, nor that you should ever marry his wives after him (his death). Verily! With Allâh that shall be an enormity.

ناظِرِينَإِنَاهُوَلَكِنْإِذَادُعِيتُمْفَادْخُلُوافَإِذَاطَعِمْتُمْفَانْتَشِرُوا وَلَامُسْتَأْنِسِينَلِحَدِيثٍإِنَّذَٰلِكُمْكَانَيُؤْذِيالنَّبِيَّفَيَسْتَحْيِيمِنكُمْوَاللَّهُلَايَسْتَحْيِيمِنَالْحَقِّوَإِذَاسَأَلْتُمُوهُنَّمَتَاعًافَاسْأَلُوهُنَّمِنوَرَاءِحِجَابٍذَٰلِكُمْأَطْهَرُلِقُلُوبِكُمْوَقُلُوبِهِنَّوَمَاكَانَلَكُمْأَنتُؤْذُوارَسُولَاللَّهِوَلَاأَنتَنكِحُوا أَزْوَاجَهُمِنبَعْدِهِأَبَدًاإِنَّذَٰلِكُمْكَانَعِندَاللَّهِعَظِيمًا

তোমরা খোলাখুলি কিছু বল অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

Whether you reveal anything or conceal it, verily, Allâh is Ever All-Knower of everything.

إِنتُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّاللَّهَكَانَبِكُلِّشَيْءٍعَلِيمًا

নবী-পত্নীগণের জন্যে তাঁদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নি পুত্র, সহধর্মিনী নারী এবং অধিকার ভুক্ত দাসদাসীগণের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে গোনাহ নেই। নবী-পত্নীগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয় প্রত্যক্ষ করেন।

It is no sin on them (the Prophet's wives, if they appear unveiled) before their fathers, or their sons, or their brothers, or their brother's sons, or the sons of their sisters, or their own (believing) women, or their (female) slaves, and keep your duty to Allâh. Verily, Allâh is Ever All-Witness over everything.

بْنَاءِأَخَوَاتِهِنَّوَلَّاجُنَاحَعَلَيْهِنَّفِيآبَائِهِنَّوَلَاأَبْنَائِهِنَّوَلَاإِخْوَانِهِنَّوَلَاأَبْنَاءِإِخْوَانِهِنَّوَلَاأَ
دًانِسَائِهِنَّوَلَامَامَلَكَتْأَيْمَانُهُنَّوَاتَّقِينَاللَّهَإِنَّاللَّهَكَانَعَلَىكُلِّشَيْءٍشَهِيدًا

এই দিব্যবচনের শেষ কথাটি আমার বড়ই পছন্দের। আমি নিজেও তাঁহাদের মাতা বলিয়াই মনে করি। ইহার পর আরও বলা হইল-
"হে রসুল! আপন স্ত্রী কন্যা তথা মোমিন দিগের স্ত্রীদের বলুন যে তাহারা যেন বস্ত্রের একাংশ আপ্ন দেহে জড়াইয়া রাখে, আপন দৃষ্টি সংযত করে এবং নিজ মর্যাদা রক্ষা করে। ----------

যদি এইসব নিয়ম জয়নবের গৃহে যাইবার পূর্বে প্রচলিত হইয়া যাইত তবে জয়নবের সংসার বাঁচিয়া যাইত, মহম্মদ নিজে কলঙ্ক হইতে বাঁচিতেন। কিন্তু পর্দা করিয়াই কি মোমিনরা তাঁহার কীর্তি হইতে নিস্তার পাইয়াছিল? মনের মধ্যে সাধুতা আনয়ন করাই অসৎ কর্মের প্রকৃত ঔষধ। মহম্মদ যদি এই বিষয়ে যত্ন লইতেন তবে হয়ত নিজের ধর্ম ও ধর্মের অনুসারীদের প্রকৃত মঙ্গল হইত। ম্যোরসাহেব এক কাহিনী আছে, যিনি হজ্ব করিতে মক্কায় গিয়া আরবের অবস্থা স্বচক্ষে এইরূপ দেখিয়া আসিয়াছিলেন-

মহিলারা ১০-১২ খানি করিয়া বিবাহ করিত। দুই চারিটি মাত্র বিবাহ করিয়াছে এমন আওরাৎ এর সংখ্যা বেশ অল্পই ছিল। পতি বৃদ্ধ হইয়া গেলে অথবা অন্য কেহ পছন্দ হইয়া গেলেই তাহারা মক্কাশরীফে আসিয়া মামলা-খতম করিয়া লইত। পুরাতন পতিকে ত্যাগ করিয়া নূতন বিবাহ করিয়া ফেলিত। এমনই ছিল পরদার মহিমা।

হারেমের শোভা

এতক্ষন আমরা রঙ্গিলা রসুল এর দস্তুরমত গৃহস্থজীবনের আলোচনা করিতেছিলাম, সেজন্য অন্যদের ইহার মধ্যে আসিতে দেওয়া হয়নাই। কিন্তু এইবার তাহার ব্যতিক্রম করিতে হইবে। কারণ মহম্মদ আর যাহাদের আনিয়াছিলেন তাহারা কেবল ইহুদিনী ছিল। মহম্মদের জিদ ধরার পরেও তাহারা ব্যাভিচারে সম্মত ছিল না। ব্যাপারখানি পাঠকের পক্ষে বুঝা কঠিন হইবে যদি না মহম্মদের সহিত ইহুদীদের সম্পর্ক বিষয়ে কিছু বিবরণ না দেওয়া হয়। দেখা যাক!

হিজরত (দেশত্যাগ) এর পর মহম্মদকে ইহুদীদের ধর্মের বহুরকম প্রশংসা করিয়া তাহাদের নিকট নিজ মতবাদের সার্টিফিকেট লইতে হইয়াছিল। পরে যখন তাঁহার অনুসারীদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইল তখন সেই ইহুদীরাই মহম্মদের গলার কাঁটা বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন তিনি উহাদের ঘেরাও করিয়া ফেলিতে সক্ষম হইলেন। ইহুদীরা যখন ক্ষমাপ্রার্থনা করিল তখন তিনি উহাদের কোতল করার সিদ্ধান্ত করিলেন। শত শত ইহুদী তলোয়ারে দুইখানা হইয়া গেল। একজন ইহুদিনীকেও তাঁহার আদেশে কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল।

'রেহানা' নামের এক আওরাৎ এর প্রতি অবশ্য মেহেরবানি করা হইয়াছিল। প্রথমেই তাহাকে আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছিল। দেখিতে শুনিতে সুন্দর ছিল বলিয়া সে মহম্মদের জন্য রিজার্ভ ছিল। মহম্মদ যখন তাহাকে বিবাহের আবেদন জানাইলেন তাহা সে নামঞ্জুর করিয়া দিল। ইসলাম কবুল করার প্রস্তাবেও সে সম্মত হইল না। শেষে মহম্মদ তাহাকে রক্ষিতা বানাইয়া রাখিলেন। অবশ্য সে বেচারী বেশিদিন জীবিত রহিল না। ভাই বেরাদরদের মৃত্যু এবং রসুলের মেহেরবানির চাপে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়া গেল।

বনি মুস্তলক গোত্রের উপর আক্রমণের কথা আমরা আগে বলিয়াছি। যেখানে আয়েশা হারাইয়া গিয়াছিলেন এবং নানা বদনাম রটিয়াছিল। এই যুদ্ধে অন্য মালামালের সহিত জোয়েরিয়া নামের ইহুদিনীও আসিয়াছিল যাহার নিলামের সময়ে মুহম্মদ ডাকাডাকিতে দাম বাড়ানোর সুযোগ না দিয়া প্রথমেই তাহাকে কিনিয়া লইলেন (eBay তে Buy It Now এর মতো) এবং বিবি বানাইয়া ফেলিলেন। জোয়েরিয়া যখন মুহম্মদের গৃহে আসিল তখন তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়াই আয়েশা বুঝিয়াছিলেন এ আর বিদায় হইবে না, আর এক সপত্নী বাড়িয়া যাইবে। আর হইলও তাহাই।

খাইবার এও ইহুদীদের এক বসতি ছিল। সেখানেও মহম্মদ চড়াও হইয়া দখল করিলেন। তাহাতে উহাদের সর্দার 'কনাণ' এর মৃত্যু হইল আর তাহার বিবি দখলে আসিল। মুহম্মদ তাহাকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সে সম্মত হইয়া গেল। আবার মদীনায় ফিরিবার কোনো কথাই হইল না। সেখানেই মাটি ফেলিয়া দস্তরখান বানানো হইল ও খেজুর মাখন এর নিমন্ত্রণ হইয়া গেল। নূতন বিবিলে সাজাইয়া মহম্মদ যখন কামরায় লইয়া গেলেন তখন চারিপাশে বিশ্বাসী অনুচরেরা প্রহরায় ছিল। আশঙ্কা ছিল এই বেজাতের আওরাৎ বদলা লইবার জন্য কিছু করিয়া ফেলিতে পারে। অবশ্য তেমন কিছু হয়নাই। এই বিবির কপালে এক ক্ষতচিহ্ন ছিল। যখন মুহম্মদ তাহার কারণ জানিতে চাহিলেন তখন সে উত্তর দিল যে আমি একরাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম আকাশ হইতে চাঁদ আমার কোলে পড়িতেছে। আমার পতিকে ইহা জানাইতে তাহার মনে সন্দেহ হইল। "হারামজাদী! পয়গম্বরেকে বিবাহ করার শখ হইয়াছে?" এই বলিয়া সে আমার মাথায় আঘাত করিল। সেই হইতেই এই দাগ হইয়াছে। পাঠক আশা করি সকলই বুঝিয়াছেন। যাহার অন্তরে পূর্ব হইতেই মুহম্মদের বাস, তাহার চরিত্র লইয়া আর কথা কি থাকিতে পারে! ইহার পর মুহম্মদ খাইবার হইতে মদীনায় ফিরিলেন। সেখানে আবার আবু সফিয়ার কন্যা ওম্মহবিবি কে বিবাহ করিলেন।

ইংরাজী ৬২৬ সনে মহম্মদ কাবায় হজ্ব করিলেন। ইহা তাঁহার প্রথম হজ্ব ছিল। এজন্য কাবার পুরোহিতদের নিকট তিনি অনুমতি পাইয়াছিলেন। এখানেও মুহম্মদ তাঁহার কীর্তি স্থাপনের সুযোগ ত্যাগ করেন নাই।

চাচা আব্বাস এর বিধবা স্ত্রী মৈমূতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর ছিল আর সম্পর্কেও তিনি মুহম্মদের নিকটাত্মীয় ছিলেন। দেখাশুনা ঠিকভাবে করার জন্য মুহম্মদ তাঁহাকেও নিজগৃহে আনিয়া রাখিলেন। মদীনার মসজিদে যেখানে আগে নয়টি কক্ষ ছিল সেখানে আর একটি বানানো হইল।

ইহা ছিল মহম্মদের বাস্তবিক বিবিদের কাহিনী। যেগুলিকে মহম্মদ কুরানের বক্তব্যমতে দক্ষিণ হস্তে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এছাড়াও তিনি যেসব রক্ষিতা পালন করিতেন তাহারা আলাদা ছিল।

মারিয়াঃ-

ইংরাজী ৬২৮ সন এ মহম্মদ তাঁহার গভর্ণরকে লকোকষ এর নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু সে মহম্মদের পয়গম্বরীতে বিশ্বাস করিত না। ফলে কিঞ্চিত তলোয়ারবাজীর দ্বারা তাহার ঈমান মজবুত করিয়া দিতে হইল। অতঃপর সে সম্পর্ক স্থাপন করিতে সম্মত হইয়া দুইখানি সুন্দরী ভেট পাঠাইল। তাহাদের একজনের নাম ছিল 'মারিয়া'। [হাদিশ মুসলিমঃ তাফসীর হুসেনী]

মসজিদের কক্ষে মহম্মদের অন্য বিবিদের সহিত মারিয়ার স্থান হইল না। যেহেতু সে রক্ষিতা ছিল তাই তাহার জন্য আলাদা বাগানবাড়ি প্রস্তুত করা হইল। সেখানে মুহম্মদ মাঝেমধ্যে সময় কাটাইয়া যাইতেন।

মারিয়া কে লইয়া মহম্মদের বদনাম আছে যে কুরানে কি মাগী পুষিবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে? মহম্মদের গৃহে রক্ষিতা ছিল, এ লইয়া না তাঁহার বিবিরা আপত্তি করিয়াছেন না তাঁহার অনুগত বান্দারা।

একবার কোথা হইতে তিন জন মাগী লাভ হইয়াছিল। মহম্মদ সেগুলির এক-একটিকে শ্বসুর আবুবকর এবং উসমান এর নিকট এবং তৃতিয়টিকে জামাতা আলির নিকট ভেট পাঠাইয়াছিলেন। আজকের দুনিয়া এসব শুনিয়া ছিছি করিবেই; জামাতা-স্বশুরের সহিত এমন ব্যবহার! শাবাস মুহম্মদ!!

হিন্দুস্তানে শ্বসুরকে পিতার ন্যায় ও জামাতাকে পুত্রের ন্যায় মনে করা হয়। এমন শ্রদ্ধেয় গুরুজন এবং স্নেহের পাত্রকে মাগী পাঠানোকে কোনো ভদ্রলোকে কখনোই প্রশংসা করিতে পারিবে না, কিন্তু সেইকালে আরব দেশে এসব প্রথা চালু ছিল। তাছাড়া ফেরেস্তাগণ সাক্ষ্য দিয়া যাহাকে বৈধ করিয়া দিয়াছে তখন কে এমন কাফের আছে যে পয়গম্বরকে গিয়া বলিবে যে তুমি অবৈধ কর্ম করিতেছ!

বিপদের কথা এই যে এইবার মুসলমানেদের মধ্যেও মহম্মদের এই সকল কাজকর্মের ফলে খটকা লাগিতেছিল। সৈয়দ আমীর আলি এই কথাগুলি ঢেকুরটিও না তুলিয়া একেবারে চাপিয়া হজম করিয়া ফেলিয়াছেন। অ-মৌলানা শিবলী ব্যাপারটির আগাপাছতলা বদল করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার মতে মুহম্মদের গৃহে এমন কোনো ঘটনাই হয়নাই। কুরানে এক সুরা আসিয়াছিল, আসুন দেখা যাক-

"হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।"
"আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

"যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেনঃ কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন, যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন।"

"তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী।"

"যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবতঃ তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী তওবাকারিণী, এবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী।"

ভাইলোগ, আপনারা কেহ কি বলিতে পারেন সে কোন গোপন কথা যাহা এক বিবি আরেক বিবির নিকট জানাইয়া দিয়াছিলেন? মহম্মদ কোন বৈধ কর্মকে অপকর্ম মনে করিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন? বেচারী গরীব বিবিদের কেন আল্লার নিকট এমন ধমক খাইতে হইল?

হাদিশে পাওয়া যায় [সহি মুসলিম; তাফসীর হুসেইনী] একদা নবীর যখন হাফজার সহিস বসবাসের সময় ছিল তখন হাফজা ছুটি লইয়া বাপের বাড়িতে ছিলেন। সেই ফাঁকে হাফজার খালি কামরায় মহম্মদ মারিয়াকে লইয়া আসিয়া সংসার পাতিয়া ফেলিলেন। হাফজা ফিরিয়া আসিয়া যখন দেখিলেন তাঁহার খাস কামরা এক মাগীর দখলে চলিয়া গিয়াছে তখন তিনি রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন। এই অবস্থায় বিবিজানের মেজাজ দেখিয়া মহম্মদ বিপদ কাটাইতে হাফজার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে হে

বিবিজান, তুমি এই মাগিবাজীর কথা গোপন রাখিলে আমিও আর কখনো মারিয়া বান্দীর সহিত সহবাস করিব না এবং আমার পর তোমার আব্বাজানই খলিফা হইবেক।

বিপদ কাটিল বটে কিন্তু হাফজা বিবির পেটে কথাটি চাপা থাকিল না। ফলে আয়েশার নেতৃত্বে বিবিদের এক সভা বসিল এবং সকলে একমত হইয়া মুহম্মদকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত লইলেন। মুহম্মদ পয়গম্বর; তাহার উপরে মদীনার একমাত্র বাদশাহ! তিনি ভাবিলেন, এই বিবিরা কোন হরিদাস পাল যে আমার উপর মেজাজ দেখাইতে চায়? তিনিও সঙ্গে সঙ্গে সেই ঐশ্বরিক অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং বিবিদের ত্যাগ করিয়া মাসখানেকের জন্য মারিয়া বান্দীর বাগানবাড়িতে গিয়া ডেরা বসাইলেন। বলিলেন, দেখি বিবিরা আমার কি করিতে পারে? তাহাদের ক্ষমতা একবার দেখি।

এর ফলে ভীষণ রকমের জটিলতা জন্মাইয়া গেল, আবুবকর গরম, ওমর গরম, ঊসমান গরম। এক মাগীর জন্য তাহাদের বেটিদের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করা হইল? মাসখানেক এইভাবে আলাদা থাকিয়া মুহম্মদের মেজাজ নরম হইয়া আসিল (হাফজার মেজাজ তিনি ভালই জানিতেন) এবং তিনি বলিতে লাগিলেন - আল্লা বলিয়াছেন হাফজার কসুর মাফ, তাহার সহিত তাহার বহিন দেরও কসুর মাফ। খোদা-খোদা করিয়া রাসুলের ঘরসংসারে ঝগড়া মিটিয়া শান্তি আসিল।

'মারিয়া'র প্রতি বাড়তি প্রেমের আরো এক কারণ ছিল যে তাহার গর্ভে সন্তান হইয়াছিল। মহম্মদের কন্যা তো ছিল, কিন্তু পুত্র হইয়া মরিয়া গিয়াছিল। মহম্মদ ওয়ারিস পাইয়াছিলেন। কাজের উত্তরাধিকার, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বংশের প্রদীপ। পুত্র কে না চায়! সৈয়দ আমীর আলি কহেন, সম্ভবতঃ মহম্মদ উপযুক্ত পুত্রের আশাতেই এতগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আশা তাঁহার কোনো বিবি পূরণ করিতে পারেন নাই, শেষে কিনা বান্দী মারিয়ার ভাগ্যে ছিল। এই নবজাতকের নাম রাখা হইল ইব্রাহিম। তাহার দুগ্ধের জন্য এক পাল বকরি রাখা হইয়াছিল।

একদিন মহম্মদ ইব্রাহিমকে আয়েশার নিকট দেখাইয়া কহিলেন, দেখ মহম্মদের বাচ্চা না? চোখে মুখে চেহারায়, রং-রূপ ব্যবহারে হুবহু মুহম্মদ। আয়েশা কিন্তু সতীনপুত্রকে দেখিতে পারিতেন না। তিনি কহিলেন "অন্য কাহারো সহিত মিল আছে কিনা দেখো। এইভাবে নিজের চেহারাখানার অপমান করা ঠিক না।" মহম্মদ যখন বালকের স্বাস্থ্যের কথা তুলিয়া কহিলেন "দেখো কেমন বলবান পুত্র।" আয়েশা তাহাতে উত্তর দিলেন "একপাল বকরি আনিয়া খাওয়াইলে সকলেই এমন ফুলিয়া উঠিবে।"

আমরা এই কাহিনীর উল্লেখ এজন্য করিলাম যাহাতে বহুপত্নীবানেরা কিঞ্চিত শিক্ষালাভ করেন। পিতা সন্তানের মুখ দেখিয়া শান্তি পাইতেছেন, আনন্দে ভাসিতেছেন আর অন্যদিকে বিবি হিংসায় জ্বলিতেছেন।

ইব্রাহিমের দুর্ভাগ্য, সেও অল্প কিছুদিন বাঁচিয়াই মা-বাপের বুখ খালি করিয়া চলিয়া গেল। মুহম্মদের চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। চেলারা শান্ত্বনা দিয়া বলিল, জীবন-মৃত্যু আল্লার হাতে বলিয়া আপনিই তো সকলকে ধৈর্য রাখিতে বলেন। মহম্মদ তখন উত্তর করিলেন, একেবারে পয়গম্বরী চালে বলিলেন, “আমিও তো মানুষ। শোক করিতে নিষেধ করি বলিয়াই কি মন পাথর করিয়া ফেলিতে হইবে?”

মহম্মদের প্রতি এই অধম লেখকের সহানুভূতি আছে। শেষ অবধি তিনিও মানুষই। তাঁহারও পুত্রলাভের ইচ্ছা হয়, সে পুত্র মরিয়া গেলে দুঃখ হয়। যদি তিনি পরমাত্মার প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া তদনুসারে চলিতেন তবে দয়াময় পরমাত্মাও তাঁহার ঝুলি ভরিয়া দিতেন।

আমরা আশ্চর্য্য হই, এই ক্রীদদাসী মাগীকে লইয়া সকলের এত দুশ্চিন্তা কেন? মুসলমানেরাও এই কাহিনীকে কালিমাখা হাতের মতই জেবের মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। আমরা তো বলিব যদি সম্ভব হয় তবে কোরান হইতে মাগী রাখিবার রেওয়াজ বাদ দেওয়া হউক, নতুবা হাফসা যে রাগে পাগল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা অবশ্যই উচিত

কাজ হইয়াছে। কারণ মহম্মদের অপকর্মে তাহার মানসম্মান একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছিল। তুচ্ছ এক খরীদা বান্দী আসিয়া তাহার কামরায় সংসার পাতিয়া বসিয়াছিল। আয়েশারও রাগের যথেষ্ট কারণ থাকে, তাহার ভগ্নীতুল্য হাফসার অপমান তাহারও অপমান। কিন্তু জয়নব যদি বিনা বিবাহেই নবীর সংসারে বিবি হইয়া আসিতে পারে তবে মারীয়া পারিবে না কেন? আল্লাহ তাহারও নিকাহ পড়াইয়া দিলেন। যেখানে দুই হৃদয় এক হইয়া গিয়াছে সেখানে আল্লাহই কাজী আর জিব্রাইল সাক্ষী। অতএব মারীয়াও নবীর পত্নী হইয়া গেলেন।

বিবিওয়ালা হজরত মুহম্মদ

হিন্দু ভাইয়েরা শ্রী কৃষ্ণকে বংশীওয়ালা বলিয়া থাকেন। বংশীই শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়। বৃন্দাবনের অরণ্য, গাভীর পাল, গোয়ালা বালকবালিকা সকলেই এই বংশীর ধ্বণীতে পাগল। অরণ্য ছাপাইয়া এক রাগ চতুর্দিকে ধ্বনিত হইতেছে, ধরিত্রী-আকাশ প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। গোয়ালা-গোয়ালিনী মাতোয়ারা, গাভীর দল মাতোয়ারা, এমনকি অরণ্যের বৃক্ষরাজিও বংশীধ্বনিতে মাতোয়ারা। ইহাই কৃষ্ণের বাল্যকাল। যখন যুবক হইলেন, কংসকে বধ করিলেন, জরাসন্ধ নিপাত করিলেন। সেখানেও রণভেরীর কাজ বংশীতেই হইয়া গেল। বৃদ্ধকালে যখন পরকালের চিন্তা আসিল তখনও বিপথগামীকে সদুপদেশ দিয়া সুপথে চালিত করিতে সেই বংশীই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে যে মহান ভগবৎগীতার বাণী তাঁহার মুখ হইতে আসিয়াছিল তাহাতেও সেই বংশীর সুর। কৃষ্ণের সমগ্র জীবনে একপ্রকার রহিয়াছে এমন একটি অভ্যাসের কথা জানিতে চাহিলে এই বংশীর কথাই মনে আসে। বাল্য হইতে মৃত্যুকাল অবধি তিনি বংশীওয়ালা ছিলেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহকে যদি দেখা যায়, তিনি কলঙ্গীওয়ালা ছিলেন। তাঁহার আগে যত গুরু আসিয়াছেন তাঁহারাও রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু কলঙ্গী (তাজ) সর্বপ্রথম গোবিন্দ সিংহজীই লইলেন। অন্যেরা নিজেই মোড়ল হয়েন নাই, গুরু প্রথমেই ময়দান মারিয়া দিলেন এবং স্বতন্ত্রতা ঘোষণা করিয়া বসিলেন। ইহাই গুরুজীর বিশেষত্ব। অতঃপর যুদ্ধ, মৃত্যু, স্বাধীনতা। আপনি মোড়ল শব্দে এক কথায় সবকিছু প্রকাশিত হয়, যেমন ফনোগ্রামের এক দোকানেই হাজার সঙ্গীত থাকে। এক কলঙ্গীওয়ালা শব্দেই গুরু গোবিন্দ সিংহের পূর্ণ চরিত্র বর্ণিত হইয়া যায়।

ঋষি দয়ানন্দকে পাঞ্জাবে বেদওয়ালা বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়। তাঁহার কথায় বেদ, কার্যে বেদ, জীবনে বেদ, মরণে বেদ, এমনকি তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসে, হাঁচি-কাশিতেও বেদের মন্ত্র নিহিত ছিল। ঋষির মন বুঝাইতে এই এক শব্দই যথেষ্টঃ বেদ ওয়ালা।

কিন্তু ভাবিয়া উঠিতে পারিনা, আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসুল মহম্মদকে এমন কী নাম দেওয়া যায় যাহাতে তাঁহার জীবনের পুরো ফটোগ্রাফ চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে! আমি মহম্মদের জীবনী শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়াছি। বড়ই আনন্দ সহকারে পড়িয়াছি, অত্যন্ত মহব্বত সহ পড়িয়াছি। শুধু তাহাই নহে, গভীর বিশ্বাস সহকারেও পড়িয়াছি। জানিবার প্রয়াস করিয়াছি, এমন কোন সূতাটি আছে, যাহাতে মহম্মদের জীবনের সমস্ত ঘটনা যুক্ত করা যায়? যাহাতে সম্পূর্ণ নকশাটি প্রস্তুত হয় এবং তাঁহার জীবন ও বাণী পরিপূর্ণভাবে জীবন্ত চিত্রের ন্যায় প্রকাশিত হইতে পারে!

মহম্মদের জীবন নাট্যের পটোত্তলন হইল যখন তিনি মাতা খাদীজাকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত লইলেন। ইহার পূর্বের জীবন তো কেবলমাত্র এই বিবাহের রিহার্সাল। হজরৎ খাদীজাকে বিবাহ করিলেন এবং পয়গম্বর হইয়া গেলেন।

মহম্মদের পয়গম্বরী প্রথম কে স্বীকার করিলেন? তাঁহার বিবি খাদীজা। মক্কায় সমস্ত সমস্যা হইতে কে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন? বিবি খাদীজা। আমি তো বলি, ২৪ হইতে ৪০ বৎসর বয়স অবধি মহম্মদের জীবনে যদি অলৌকিক কিছু ঘটিয়া থাকে তবে তাহা খাদীজার কামাল মাত্র। বলা হয় এই সময়েই মহম্মদ পয়গম্বর হইয়াছিলেন, ইহা সত্য হইলে মহম্মদের পয়গম্বরী খাদীজারই দান।

কিন্তু খাদীজা যখন দেহরক্ষা করিলেন মহম্মদ মক্কা ত্যাগ করিয়া হিজরৎ করিলেন। তাহার পর তিনি মাদা সুদার সহিত শাদী করিলেন, আয়েশার সহিত শাদী করিলেন, হাফসার সহিত শাদী করিলেন, পুত্রবধু জয়নব এর সহিত শাদী করিলেন, বন্ধুপত্নী

জয়নব (২) এর সহিত শাদী করিলেন, মায়মুনা, জোয়েরিয়া ইত্যাদিকেও শাদী করিলেন। মারিয়া কিবতি নামক মাগীটিকেও বিনা বিবাহেই আনিয়া রাখিলেন।

যখন মহম্মদের বয়স ৫০ বৎসর সে সময় খাদীজা দেহরক্ষা করেন। ৬২ বৎসর বয়সে মহম্মদ নিজেও মরিয়া গেলেন। এই ১২ বৎসর সময়ে মহাশয় দশটি আওরাৎকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। প্রতি সওয়া সালে একটি করিয়া।

মহম্মদ অত্যধিক বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযোগ করিতেছি কি? কখনই না, মহম্মদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি বাক্য উচ্চারণ করিলেও জিহ্বা অগ্নিদগ্ধ হইবেক। তদুপরি মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে পবিত্রতার সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মহম্মদ পবিত্র, তাঁহার চিন্তা পবিত্র। এমন পবিত্র সৃষ্টির উপর পরমাত্মার কৃপাদৃষ্টি না পড়িলে আর কোথায় পড়িবেক?

অষ্টম হেনরী, যিনি ইংলিস্তানের বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবন কেবল শাদী আর তালাক দিয়াই পার হইয়াছিল। বাদশাহের সময়কাল লম্বাচৌড়া ছিল, যাহা স্মরণে রাখাও কঠিন। অবশেষে আমি এই সূত্রটিকেই অবলম্বন করিলাম, তাঁহার বিবিদের নাম মুখস্থ করিলাম, তাহাদিগকে বিবাহের এবং বিদায় দিবার কাহিনী মুখস্থ করিলাম। ইহাতেই বাদশাহ হেনরীর ইতিহাস মুখস্থ হইয়া গেল।

বাদশাহ অষ্টম হেনরী কেবল ৬ টি বিবাহ করিয়াছিলেন, আর তাহাতেই তাঁহার সমগ্র জীবন পার হইয়া গেল। মহম্মদ মাত্র দশ বৎসরে অনেক বেশি বিবাহ করিয়াছিলেন। ব্যস, মহম্মদের জীবন হেনরীর জীবন অপেক্ষা অনেক বেশী রঙ্গীন ছিল, এইটুকুই বলা চলে।

উদাহরণ হিসাবে কোনো যুদ্ধে হজরতের বিজয় হইল! তো মনে হইল যেন পরমাত্মার পবিত্র সৃষ্টির সুন্দরতা চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া গেল। ব্যস! অতঃপর আর কী?

মেহফিল জমিয়া গেল, আর যুদ্ধে যাহাদের আত্মীয়বন্ধু মরিয়াছে তাহারা তো শোকার্ত ছিলই। অনাথ পুত্র পিতার শোকে কাঁদিতেছে, বিধবা তাহার পতির শোকে কাঁদিতেছে, পুত্রকে হারাইয়া পিতা কাঁদিতেছে কিন্তু রঙ্গীলা রসুল কি তাহাদের শান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছেন? না, তিনি হারেম বড় করিতেছেন, অষ্টপ্রহর দুলহা সাজিয়া আছেন, নিমন্ত্রণ দিতেছেন। দুইটি খেজুর খাওয়ালেন আর ঘরে বিবি ঢুকাইলা লইলেন। কত অভাগিনী এক নিমেষেই ভাগ্যবতী হইয়া গেল।

মহম্মদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় পত্নী আয়েশা ফরমাইয়াছেন যে পয়গম্বরের তিন চীজ বড়ই প্রিয় ছিল। প্রথম আওরাৎ, দ্বিতিয় আতর আদি সুগন্ধী, তৃতীয় খাদ্য। খাদ্যের তো অভাব ছিলনা, আতর আদি সুগন্ধী দ্রব্যও ইচ্ছা অনুসারে পাওয়া যাইত। আউরাৎ যখন পয়গম্বরের এতই প্রিয় ছিল তখন যদি আমরা তাঁহাকে বিবিওয়ালা মহম্মদ বলি তাহা কি অনুচিত হইবেক? বিবিওয়ালা বলা হইলেই মহম্মদকে পাওয়া গেল, তাঁহার অন্তরাত্মাকে পাওয়া গেল, তাঁহার রঙ্গীলা চিত্র চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া গেল।

কৃষ্ণ যেমন বংশীওয়ালা, গুরু গোবিন্দ সিংহ কলঙ্গীওয়ালা, রাম যেমন ধনুকওয়ালা, দয়ানন্দ যেমন বেদ ওয়ালা তেমনই মহম্মদ বিবি ওয়ালা। তিনি সকল পয়গম্বরের শ্রেষ্ঠ। সকলে একবার বলুন, জয়, বিবিওয়ালা মহম্মদের জয়!!

মহম্মদের অভিজ্ঞতা

আমি মহম্মদের উপর ফিদা হইলাম কেন? তিনি দশখানি বিবি জুটাইয়াছিলেন বলিয়া? তাহা নহে, আমি সকলকে সাবধান করিতে চাই যে বিবি দিয়া ঘর পূর্ণ করিয়া ফেলা আদৌ বুদ্ধিমানের পরিচয় নহে। আমরা আগেই বলিয়াছি, ইহার ফলে মহম্মদকে বড়ই তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইয়াছিল। তিক্ত হইলেও মহম্মদের জন্য ইহা ঔষধের কাজ করিয়াছিল। যেমন যেমন অভিজ্ঞতা হইতে লাগিল, তেমন তেমন নিজের ভুল ধরা পড়িতে লাগিল। প্রথমে তো মুমিনদের জন্য বিবি রাখিবার কোনো সীমা ছিল না, কিন্তু পরে চারটি বিবির আদেশ দেওয়া হইল।

এখানেও শর্ত দেওয়া হইয়াছে যে যদি সবার প্রতি ন্যায় করিতে পারো তবেই চারটি বিবি রাখিবে। ঐ সুরাতেই একই সঙ্গে বলা হইয়াছে যে তোমরা ন্যয় করিতে পারিবে না। ইহা যদি বহুবিবাহের নিষেধ না হয় তবে ইহা কী? নিজে তো বৃদ্ধ বয়সে অসুবিধায় ছিলেন কারণ শরীরের শক্তির সঙ্গে কল্পনাশক্তিও ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছি। তথাপি যে অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাহার উপায় কী? এই বয়সে অভ্যাস বদল করা সহজ নহে। তাই অনুসারীদের জন্য "আমি তো পারিনাই, কিন্তু তোমরা করিও" উপদেশ রাখিয়া যাওয়া হইয়াছে। আর মহম্মদও যদি বিগত জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারিতেন তবে অধিক পত্নীর কথা শুনিলেই কর্ণে হাত দিতেন। মারিয়ার কথা কি তাঁহার স্মরণ ছিলনা? যখন সমস্ত বিবি একজোট হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল? গৃহের অন্ন জুটিতনা সে এক কথা আর মানসম্মান নষ্ট হওয়া আরেক কথা। এও ধর্মে রক্ষা করিয়াছে যে কোনো বিবির পুত্র হয়নাই, নতুবা ইব্রাহিমকে আয়েশার নিকট দেখানো এবং তাহার চেহারা লইয়া আয়েশার নাক উঁচু করিয়া ঠাট্টা করা! বুদ্ধিমানের জন্য তো ইশারাই যথেষ্ট। আলি ও আয়েশার পরস্পরের প্রতি বিরূপতাও চিরকাল মহম্মদের হৃদয়ে কাঁটা হইয়া ছিল।

তিনিও জানিতেন যে তিনি নিজেই নিজের অনুসারীদের অধোগতির ব্যবস্থা করিতেছেন যাহা একদিন তাহাদিগকে শেষ করিয়া ফেলিবেক।

এর উপর প্রশ্ন উঠিতেই পারে যে পরিষ্কার ভাষায় বহুবিবাহ বন্ধ করার আদেশ দেওয়া হইল না কেন? কিন্তু হজরৎ এমন স্পষ্ট করিয়া বলিলে তাহা নিজের উদাহরণেরই দুর্নাম করা হইয়া যাইত। বারোটি বিবি রাখিয়া অনুসারীদের কিভাবে একটিমাত্র বিবাহ করিতে বলিতেন? এমন দুঃসাহস দেখানো কাহার পক্ষেই বা সম্ভব? আখেরী পয়গম্বরের মানসম্মানের জন্য ইহা বিশেষ সুবিধাজনক ছিলনা। আমরা সৈয়দ আমীর আলির সহিত সহমত যে এই আয়াতের কোনও গুরুত্ব নাই! যদি ইহাতে বহুবিবাহের উপর নিষেধ আরোপ না থাকে। হাঁ, শব্দ চয়নে আলগা দেওয়া হইয়াছে যাহার কুফল মুসলমান সমাজ অদ্যপি ভোগ করিয়া চলিতেছে। মোল্লারা ন্যায় করিবার অর্থ বোঝে খানাপিনার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যদিও সৈয়দ আমীর আলি ইহাতে মহব্বতের সমতা পর্যন্ত টানিয়াছেন। তাঁহার কথন অনুসারে এমন ন্যায় করা মনুষ্যশক্তির সাধ্য নহে। তাই এই আদেশ স্পষ্টরূপেই বহুবিবাহের বিরোধিতা করে। আমরা সৈয়দ আমীর আলির ভাবনাই সঠিক মনে করি। কারণ এই বয়সে মহম্মদের মনে হূর-পরীর চিন্তাও আসিত না।

ইসলামের অনুসারীরা মহম্মদের উপদেশ মান্য করেনা বরং পীর-ফকিরদের বয়ান মহম্মদের বিবাহ বিষয়টিকে অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছে। এজন্য ইসলামপন্থীদের সংস্কৃতির দুর্বলতাকে অনেকাংশে দায়ী করা যায়। খলীফাদের ভোগলালসার সমর্থনে এইভাবেই জায়েজকে নাজায়েজ বানাইয়া দিয়াছে আর নিজেদের যথাসাধ্য সুবিধা করিয়া লইয়াছে। অন্যদিকে কিছু উপদেশের ইশারামাত্রকে লোপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাপি এই সভ্যতার জন্য আমরা মহম্মদের প্রশংসা না করি এবং মুসলমান ভাইদের অনুরোধ করি তাঁহারা যেন রঙ্গীলা রসুলের জীবন হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার মিত্রসূলভ শিক্ষার পরে তাঁহার বাক্য বিষয়ে উল্টাসিধা দুর্নামের প্রতি মনযোগ না দেন।

মহম্মদের উপর আমার এত ভক্তি কেন? সে কি এইজন্য যে তিনি তাঁহার অনুসারীদের জন্য তালাক দিবার ব্যবস্থা রাখিয়াছেন? না! না!! বরং তালাকের অনুমতি তো বিবাহকে এক অস্থায়ী সম্পর্কে পরিণত করে। গৃহস্থালীর কোনো স্থায়ী ব্যবস্থাই হইতে দেয় না। ভোপালের বেগম সাহিবা যখন হজ্জ উপলক্ষে আরব তখন আরবের মহিলাদের সহিত তাঁহার যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে বিবাহ যদি ছেলেখেলা হইয়া ওঠে তবে তাহার কোনো গুরুত্বই থাকে না। এই কারণেই আরবে বেগম সাহেবা এমন মহিলা কমই দেখিয়াছিলেন যাহার দুই এর কম পতি। অনেকে তো দশ পতির ঘর করিয়া আসিয়াছে এমনও দেখিয়াছিলেন। পুরুষজাতিকে যদি এইরূপে তালাক দিবার নিঃশর্ত অনুমতি দেওয়া হয় আর নারীদের পতিব্রতা থাকতে বলা হয় তবে তাহারাও প্রেমালাপের পথ অনুসন্ধান করিয়া লইবেই।

আমাদের দেখিতে হইবে মহম্মদ এই বিষয়ে কী বলেন। কুরানে আওরাৎ এর উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় যেখানে তাহাকে অর্থ দিতে বলা হইয়াছে। (সুরা নিসা)

অর্থের বিনিময়ে আওরাৎ খরীদ করা পাপ বিবেচিত হয় না, অতএব জবরদস্তি অপেক্ষা কিছু উত্তম বলিতেই হইবে। আওরাৎ এর যে কিছু মূল্য আছে, ইহাই যথেষ্ট। রাসুলের প্রিয় এই আওরাৎ জাতির উপর যে অগণিত রহমৎ বর্ষিত হইয়াছে ইহা তাহার প্রথম উদাহরণ। ইহাকেই আরবি ভাষায় মুতাহ বিবাহ বলে। ইরাণে এখনও ইহার প্রচলন আছে, কিন্তু ইরাণীদের পাপ মহম্মদের উপর দেওয়া চলে না, কারণ তাহারা তো একটি আয়াত পড়িয়াই গুলমহম্মদ হইয়া গিয়াছে।

মহম্মদ পরে আরও প্রগতি দেখাইয়াছেন। বিবাহকে এমন কৃত্রিম অস্থায়ী সম্পর্ক হইতে কিছুসময়ের জন্য স্থায়িত্ব দিয়াছেন, এমন-কি তালাকের উপরেও শর্ত আরোপ করিয়াছেন যাহাতে কোনো মিয়াঁ তাহার বিবির উপর বিরক্ত হইয়া ওঠে আবার তালাকের পর তাহার মন নরম হইয়া আবার ঐ বিবির দিকে যায় তবে যাহাতে উহা নিক্ষেপিত তীরের উদাহরণ না হইয়া যায় সেজন্য সাফসাফ কহিয়া দিয়াছেন যে প্রথম তিন

তালাকের ক্ষেত্রে প্রতি তালাকের জন্য তিন-তিন মাস অবধি পুনরায় বিবাহ না করিয়া থাকা উচিত। তবে এই আইন কেবল আওরাৎ এর জন্য। মরদের উপর এমন কোনো শর্ত নাই, সে যদি দুইখানিও করিয়া লয় তবুও কোরানের সীমা অতক্রম হইবেক না। এক আয়াতে না হোক, অন্য আয়াতে তো হইল। এসব কি তামাশা নাকি?

ইহার পর আবার হালালা নামক শর্ত যোগ করা হইল যে যদি কোনো ছেলেমানুষ পতিদেব বার বার তালাক দিতে থাকে তবে তৃতীয়বার তালাক দিবার পূর্বে যেন কিঞ্চিৎ সংযত হয় সেজন্য কানুন বানাইলেন যে তৃতীয় তালাকের পর সে বিবি হারাম হইয়া যাইবে। যদি সে অন্য কোনো মরদকে বিবাহ করে, তাহার সহিত এক সয্যায় যাপন করে এবং তাহার পরে তালাকপ্রাপ্ত হয় তবে আবার প্রাক্তন পতিদেব তাহাকে পুনর্বিবাহ করিতে পারিবেন। (সুরা বকরা)

লোকে তো ইহাই বলিবে যে এমন প্রথা অসভ্যতার লক্ষণ। সৈয়দ আমীর আলি লিখিয়াছেন যে ইহা আরবদের লজ্জিত করার জন্যই বলা হইয়াছিল। রসুল চাহিয়াছিলেন যাহাতে কেহ দুই তালাকের বেশি অগ্রসর না হয়। হালালা বিবাহ বাস্তবে প্রচলিত হইবে এমন চিন্তা তাঁহার কল্পনাতেও ছিলনা।

সত্যকথা স্বীকার করিতে আমাদের কোনো সমস্যা নাই যে আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা এমন অসভ্য প্রথা পালন করুক তাহা আমরা দেখিতে চাহি না। যদিও এমন কুকর্মের বেশ কিছু উদাহরণ আছে, তাহা আইন বানানোর দোষে হইয়াছে। মহম্মদের চরিত্রের বিন্দুমাত্রও দোষ নাই।

সৈয়দ আমীর আলি লিখিয়াছেন যে এই আয়াতের পরে আরেকটি আয়াত নিকাহ অধ্যায়ে আসিয়াছে যাহাতে হালালা বিবাহের হুকুম রদ হইয়া গিয়াছে। যদিচ ইহা মাননীয় মহাশয়ের একলার মত তথাপি আমাদের জন্য শীরোধার্য। আমরা তো পুরা কোরানই একসাথে রদ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। এখন তাঁহার কুরানী ভাইয়েরা

তাঁহার উপদেশ মানিয়া লইলেই হালালা হইতে মুক্তি মিলিতে পারে, সেইসঙ্গে তালাক এর যে আপদ তাহাও মন্দের-ভাল; দুই দফাতেই সমাপ্ত হইতে পারে। তালাকের মধ্যেও অনেক সমস্যার মূল নিহিত আছে। হজরৎ নিজেই জয়নব (আপন পুত্রবধু, অর্থাৎ জায়েদের বিবির) তালাক করাইয়াছিলেন। মুখ ফুটিয়া হুকুম না দিলেও ইশারায় তো বটেই। মুখে যাহাই বলুন, মনে তাঁহার কী ছিল সে বিষয়ে কোরানই হাটে হাঁড়ি ফাটাইয়া দিয়াছে। এমন কর্ম করিয়া হজরৎ যে মনেমনে পস্তাইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পর্দার বাড়াবাড়ি দেখিয়া বুঝা যায়। মহম্মদ তাঁহার বিবিদের উপরেও নারাজ হইয়াছিলেন। একমাস কাল তাহাদের দূরে রাখিয়া তাহাদের ও নিজেকেও কষ্ট দিয়াছিলেন। তখন কেন তালাক দিলেন না? বরং সেই বিবিদের উপর ক্ষেপিয়া আল্লামিয়াঁ মারফত চিঠিপত্র চালাইলেন, তালাক দিবার হুমকিও দিলেন, কিন্তু তালাক দিলেন না। লিখিত আছে, সুদা যখন বুড়ী হইলেন তো হজরৎ তাহাকে তালাক দিতে চাহিয়াছিলেন। তখন সুদা তাহার ভাগ আয়েশাকে দিয়া দিল আর আল্লামিয়াঁর সুপারিশে মহম্মদ তালাকের পাপ হইতে নিস্তার পাইয়া গেলেন। সুদাও বাঁচিয়া গেল।

বাস্তবিক মহম্মদ তালাক দেওয়া অনুচিত মনে করিতেন। এ বিষয়ে হাদিস আছে, আর আমরা ত কোরানকেও হাদিস বলিয়াই মনে করি। আল্লাহ অন্য কিছুতে এত দুঃখিত হন না যাহা ঘরওয়ালীকে তালাক দিলে হইয়া থাকেন।

মহম্মদ মৃত্যুকাল অবধি খোদাকে খুশি রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রাণ ভরিয়া বিবাহ করিয়াছেন এবং একটিকেও তালাক দেন নাই। বাহ, আলে-মহম্মদ! ধার্মিক মহম্মদ!! তোমরা সকলে মহম্মদের উদাহরণ লক্ষ্য করো। বলো, তালাক নাজায়েজ! তালাক নাজায়েজ!! তালাক বিলকুল নাজায়েজ!!!

এইবার আপনারা হজরত মোহম্মদ সাহেব এর সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্বাদ জানিবেন এবং তাঁরা রঙ্গীলা জীবনের বিশেষ অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ করিবেন।

ধন্যবাদ

রামধনু রঙ

পাঠক, এতক্ষণ তোমরা রঙ্গীলা রসুল এর জীবনের বিভিন্ন রঙ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিলে। তোমার মনেও কি কোনও রঙ লাগিয়াছে? মহম্মদ অভিজ্ঞ পয়গম্বর ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান হইতে ফায়দা উঠাও। দেখ, রঙ্গীলার কেবল এক রঙ নহে, তাঁহার জীবন এক রঙধনু, সেখানে সমস্ত রঙই আছে।

১) ২৫ বৎসর বয়স অবধি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিও। যেমন মহম্মদ কাটাইয়াছেন। আর হাঁ, কদাপি মনে কাম-বাসনার স্থান দিওনা।

২) ভুল করিয়াও জীবনে কখনও ৪০ বৎসরের বুড়ীকে বিবাহ করিও না। নিতান্ত যদি কোনো বয়স্ক মহিলার কোলে শুইয়া থাকার ইচ্ছা হয় তবে তাহাকে মা বানাইয়া লইবে, বিবি কদাপি নহে।

৩) পুতুল খেলা বালিকাকে শাদী না করিও। নতুবা বালিকা খেলা করিতে করিতেই বিধবা হইয়া যাইবে আর বাকি জীবন কাঁদিয়া কাটাইবে। নিতান্ত যদি বালিকার আকর্ষণ ছাড়িতে না পারো তবে তাহাকে কন্যা বানাইয়া লওয়াই ভাল হয়।

৪) পুত্রবধু, তাহা নিজপুত্রের হোক বা পালিত পুত্রের, তাহাকে নিজের কন্যা মনে করিও। নতুবা না-হক পর্দা লাগাইয়া ফিরিতে হইবেক। দুনিয়ার তাবৎ সুন্দর বস্তুকেই পর্দায় ঢাকিয়া ফেলিতে হইবেক।

৫) মাগী পোষা সর্বদাই খারাপ। তাহার সন্তানকে বিবিরা কখনোই স্বীকার করেনা। তাহাকে সোহাগ করিলেও বিবিদের প্রাণ জ্বলিবে। তাহাতে তোমারও জীবনের সব আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাইবে।

৬) বিবি একের বেশি হইলেই ঝঞ্ঝাট। ঘরে ঝঞ্ঝাট, বাহিরে ঝঞ্ঝাট। একা রাখিয়াও শান্তি নাই, ভীড়ের মধ্যেও শান্তি নাই। আপসে ঝগড়া করিলে বিপদ, একমত হইয়া দল করিলে কেয়ামত।

৭) নিজের বিবিকে যেমন অন্যের মাতা বলিয়াছ, অর্থাৎ আল্লামিয়াঁকে দিয়া বলাইয়াছ, তেমনই অন্যের বিধবাকেও নিজের মাতা বলিয়া মনে করিবে। ইহাও আল্লামিয়াঁর হুকুম।

আচ্ছা, এইবার পয়গম্বরীর নাটকের অদ্ভূত কাহিনী সমাপ্ত হইল। পরে অন্যকোনও কাহিনীতে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবেক। খোদা হাফেজ।

পাঠক এতক্ষণ তোমরা প্রিয় রসুলের অমূল্য অভিজ্ঞতার সার প্রাপ্ত হইলে। এইবার আমাদের রঙ্গীলা-ছবিলা-রসিলা রসুলের কিছু রঙ্গীন বাতচিত উল্লেখ করিব। মনযোগ সহ পাঠ করিও যাহাতে মানবজীবন সার্থক হইতে পারে।

একদা হজরতের নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল "আমি আমার বিবিকে পিছন হইতে জমাইতে পসন্দ করি। এই ব্যাপারে আপনার কী মতামত?" এমন প্রশ্নের সমাধানে তখনই এক আয়াত নামিয়া আসিল- "বিবিরা তোমাদের শষ্যক্ষেত্র। সেখানে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারো।"

হজরৎ ইহাও ফরমাইলেন যে উল্টা-সিধা যেভাবে ইচ্ছা জমানো যায়।

এক আউরাৎ আসিয়া শুধাইল, "হুজুর, আমার পতিদেব আমাকে উলটা করিয়া লাগাইতে চায়। এখন আমি কী করিব?" হজরৎ উত্তর দিলেন, "ফুটা যখন একই আছে তখন উল্টা-সিধায় আপত্তি কিসের?"

একদা এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল "হাত মারিলে কি রোজা খারাপ হইবে না?" তাহাতে হজরৎ জানাইলেন "বীর্যপাত না হইলে খারাপ হইবে না"।

এক বিবি একদা হজরতের সমীপে আসিয়া কহিল "হুজুর, আমার মিয়াঁ নামাজ পড়ার সময় লাগাইতে চায়। রাজী না হইলে নামাজ পড়িতে দেয়না, পিটাইতে শুরু করে। রোজার সময়েও জবরদস্তি লাগাইয়া দেয়। রোজা নষ্ট হইয়া যায়। এক্ষণে কী করা উচিত?"

হজরৎ ইহার সমাধান এক পলকেই করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন- "পতিদেবের অনুমতি ছাড়া বিবি যেন নামাজ-রোজা না করে।"

হজরৎকে এক ব্যক্তি শুধাইল "হুজুর, যদি বীর্যপাত না করিয়াই কেহ উঠিয়া যায় তবে কী হইবে?" হজরৎ কহিলেন "কেবল ধুইয়া লইলেই চলিবে। তারপর অজু করিয়া নামাজ পড়িতে হইবে।"

পাঠক, এতক্ষণ আপনারা মহাজ্ঞানী পয়গম্বরের জীবনের কাহিনী পাঠ করিয়া ফলপ্রদ জ্ঞান লাভ করিলেন। এবার প্রাণমন দিয়া একবার বলুনঃ জয়! মহাজ্ঞানী পয়গম্বরের জয়!!

সমাপ্ত

নোটঃ

এই পুস্তকে যে সমস্ত রেফারেন্স ব্যবহার হইয়াছে তাহা কেবল সুন্নী দলিল হইতে গৃহীত।

মোহম্মদ রফী।

ধর্মানুভূতিতে আঘাতের অজুহাতে প্রথম যে হত্যার ঘটনা আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাই, সেটা হচ্ছে **'রঙ্গিলা রসুল'**-কে কেন্দ্র করে। এর প্রকাশক ছিলেন লাহোরের সাংবাদিক রাজপাল মালহোত্রা। ইলমুদ্দিন নামে লাহোরের এক তরুণ বইটা না পড়েই সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি রাজপালকে হত্যা করবেন, এবং রাজপালকে তিনি ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন।

অখণ্ড ভারতবর্ষের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুর্লভ এই বইটির হিন্দি থেকে বাংলা অনুবাদ করে আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন **জুপিটার জয়প্রকাশ**। এটিকে বাংলা মুক্তচিন্তা জগতের এক অনন্য সংযুক্তি বলা চলে অনায়াসে!

একটি ধর্মকারী ইবুক

www.dhormockery.com
www.dhormockery.net
www.kufrikitab.blogspot.com
dhormockery@gmail.com